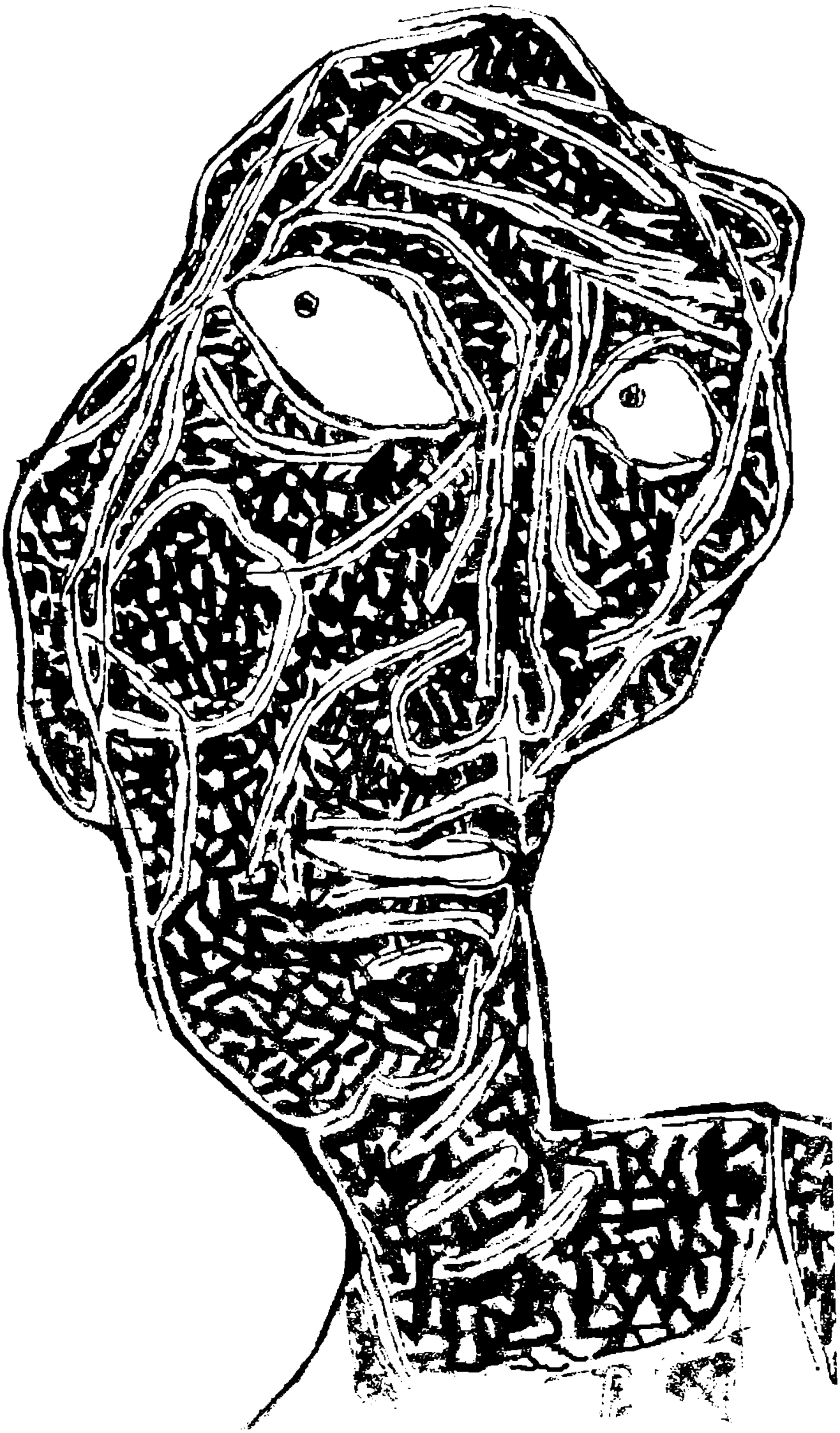

ছবি : প্রকাশ কর্মকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জঙ্গলের দিনরাত্রি

উৎসর্গ

২৬ এপ্রিল ১৯৮৭, ক্যালিফোর্নিয়ায় মোটর দুর্ঘটনায় নিহত আমার ছোটভাই ডাঃ চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ভ্রাতৃবধূ ডাঃ আলো চট্টোপাধ্যায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র অভীক চট্টোপাধ্যায়ের যাবজ্জীবন স্মৃতির উদ্দেশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্রলিপি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পার্থসারথি চৌধুরি, ভাস্কর দত্ত, কল্যাণ বসু, শংকর চট্টোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, সুবোধ বসু, আশুতোষ ঘোষ, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, চিত্ত সরকার, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল রায়, তন্ময় দত্ত, উৎপলকুমার বসু, তারাপদ রায়, লেমসা মুণ্ডা, বিজয়, দুর্গা সোরেন, হেসাডির অজানা সাঁওতাল কুলি, হেসাডির পিকনিক পার্টি, কমলাকান্ত উপাধ্যায়, নীতা বর্ধনের দাদা, এবং অধুনালুপ্ত কেউ কেউ।

নায়িকা— ফুলমণি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরিত্র প্রতিকৃতি

স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়

স্বাতীর মত মানবীরা সোজা
স্বর্গে চলে যায় এবং
তাদের সম্পর্কে তারপর আর
কিছুই জানা যায় না।

চরিত্র প্রতিকৃতি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কেউ সারাজীবনে একটি মাত্র গ্রেট নভেল লিখলে তাকে
মহান ঔপন্যাসিক বলা যায় না। অনেক গ্রেট নভেলিস্টও
লিখে যেতে পারেন না মাত্র একটি মহান উপন্যাস। এই
দু'রকম ব্যর্থতাকে তাচ্ছিল্য করে, নিজের জীবন দিয়ে সুনীল
প্রতিদিন যে উপন্যাসটি লিখে চলেছে, সে জুতোর ফিতে
বাঁধার যোগ্যতা আমাদের অনেকেরই নেই।

চরিত্র প্রতিকৃতি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

'এদেশে নবীন নামে এক জেলে ছিল
এদেশে মহুয়া খুবই পাওয়া যেত
এদেশে শুনেছে লোকে ওর কোলাহল...
ওর মত ভিক্ষাবৃত্তি কেহই করেনি!'

চরিত্র প্রতিকৃতি

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

'আমার কিছুটা দেরি হয়ে যায়।
জুতোয় পেরেক ছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাইটেল মিউজিক

কিছুদিন আগে দূরদর্শনে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' দেখানো হল। আমি এই প্রথম ছবিটি দেখলাম। না, কেন মিছে কথা বলব, আমি ওই চলচ্ছবিটি আবার সবটা দেখতে পারলাম না।

যে-টুকু দেখলাম, দোষ আমার অদূরদর্শিতার এবং যে-জন্য লজ্জিত, আমার আবারও ভাল লাগল না। ছবিটি বিদেশে উচ্চপ্রশংসিত, আমি বিশ্বস্তসূত্রে পড়েছি। কিন্তু, আমার অসহ্য বোধ হল। এ-দেশে।

এই তো সেদিন। এ বছরেই। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ, ১৯৮৭। অরণ্যে দু-রাত্রি আমরা একসঙ্গে কাটালাম। ঝাড়গ্রাম থেকে ভোরবেলা জিপ নিয়ে বেরিয়ে (রাত ভোর বৃষ্টি) বিস্তীর্ণ সুবর্ণরেখার ওপর দিয়ে নতুন ব্রিজ টপকে, গোপীবল্লভপুর ছাড়িয়ে বাঁ-দিকে টানা শালবন। মাঝখান দিয়ে লালমাটির পথ। সে পথে, মাইল দশেক এগতে দিয়ে সুবর্ণরেখা হঠাৎ পথরোধ করে দাঁড়ায়।

এখানে ব্রিজ নেই। পারাপার নেই। থাকলেও, ওপার দেখা যায় না। জঙ্গলের শেষে প্রাগিতিহাসের পাথুরে স্ল্যাব দিয়ে তৈরি বিশাল জগবন্ধু মন্দির এক। এত কাছাকাছি— আমাদের এই মেদিনীপুরেই— এত ওয়েদারবিট্‌ন, এমন পূজারীহারা দেবস্থান যে থাকতে পারে তা গিয়ে না পড়লে বিশ্বাস হবে না। মনে হবে ক্ষণিক প্রাঙ্গণ তুমি তার!

সারাদিন ওখানে কাটিয়ে ফেরার পথে রাত-অন্ধকার নেমে আসে। ফেরার পথে আবার সুবর্ণরেখা। আবার সেই ব্রিজ। জিপকে ওপারে গিয়ে দাঁড়াতে বলে, এবার পায়ে-হেঁটে ব্রিজ পেরনো, সদলবলে। সবাই চুপচাপ। শুধু নদীতে দাঁড়ের শব্দ। শুধু পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ। এই সব..... এই তো সেদিন।*

ব্রিজের মাঝামাঝি পৌঁছে কী ভেবে স্বাতী (গঙ্গোপাধ্যায়) হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। মাটির দিকে আঙুল নির্দেশ করে সে বলে ওঠে, 'ওমা, আকাশে আজ কত তারা।'

হঠাৎ, হঠাৎ-ই সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। যেন ঝুঁকে ক্রিকেট-পিচের মাটি দেখছে, তার আঙুল তখনও মাটির দিকে স্থির, তবু আমরা বোকার মতো চমকে উঠে সবাই একসঙ্গে আকাশের দিকে তাকাই। দেখি, সত্যিই, আজ যত তারা সব— আকাশে! এ-ভাবে ঠকে গিয়ে সবাই একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠি, এই তো সেদিন। কেন না, আকাশে তারা দেখার চেয়ে বোকামি আর কী, বিশেষত যখন মাটিতে তা ছড়িয়ে থাকার কথা!

'বড্ড চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলে তোমরা, তাই একটু, তাই একটু.....' স্বাতীর অ্যাপোলজির পাদপূরণ করে পার্থ, 'ঠকিয়ে দিলাম!'

'সত্যি, আকাশের গায়ে গায়ে পরশ তব, সারারাত ফোটাক তারা নব নব। ..... সত্যি, কে যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে আর তাই কেমন যেন ফুটে উঠছে তারাগুলো..... তাই না পার্থ?'

পার্থ চুপ করে থাকে। তারপর হেসে বলে, 'যদি বলি, না?'

স্বাতী: না মানে? তা নয়?

পার্থ: হ্যাঁ।

---

* জায়গাটার নাম রামেশ্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতী: কই, বলে একবার দ্যাখো দেখি।

আমি বললাম, 'ওহে ভুলে যেও না, তোমার ঘাড়ে অনেকদিন ধরে একটা মাথা!'

এমনি করেই আমরা ব্রিজটা পেরিয়ে এলাম। 'ব্রিজটা' না বলে এখানে 'জীবনটা' বললে না জানি কেমন শোনাত! সারা ব্রিজ সুনীল একটা কথাও বলল না। শুধু শুনে গেল। কিংবা, শুনল না। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই এই সব। এ-বছর ১৯৮৭। এই তো সেদিন।'

সুনীল ঝাড়গ্রামে ছিল আগের দিন থেকেই। আমি গিয়েছিলাম পার্থর সঙ্গে। কোনও প্ল্যান ছিল না। আমি জানতামও না যে সুনীল ওখানে। সি আই টি-র অফিস থেকে বেরিয়ে পার্থ বলল, 'গেলে হয়।'

'কোথায়?'

'ঝাড়গ্রামে।' বলে ও সুনীলের কথা বলল। আমি বললাম, 'দাঁড়াও, তাহলে একটা গেঞ্জি কিনে নিই।'

ব্রেবোর্ন রোডের মোড়ে ফুটপাথ থেকে আমি একটা উলিকট টাইপের গেঞ্জি কিনলাম।

ব্যস্, তারপর বিকেলবেলার ইস্পাতে।

ওদের তো বলা নেই যে আমরা যাব। সুনীল পার্থকে বলে গিয়েছিল যে, 'পারলে এসো।' ঠিকানা ঝাড়গ্রাম। কোথায় উঠব? তা তো জানি না।

রাত তখন সাড়ে আটটা হবে। ঝাড়গ্রাম প্ল্যাটফর্মে কিছু লোক নামল বটে, কিন্তু হঠাৎ ঝাঁপিয়ে-পড়া শীতের অপ্রত্যাশিত অঙ্কুশবিদ্ধতায় যূথভ্রষ্ট হয়ে কে যে কোথায় নিমেষে পালাল, বোঝা গেল না। ট্রেন চলে যেতে দেখি, প্ল্যাটফর্মে শুধু আমরা দু'জন। পার্থ বলল, 'চলো, পি ডব্লু ডি বাংলোটাই প্রথমে ট্রাই করে দেখি। পেয়ে যাই ভাল। নইলে পরের কথা পরে।' ততক্ষণে আমি জেনে গেছি যে সুনীল থাকতে পারে।

পি ডব্লু ডি বাংলোটিই সবচেয়ে কাছে, স্টেশনের লাগোয়া একরকম। রাস্তায় কনকনে হাওয়া। শীতের হাওয়ায় এত জোর? একটা শালপাতার ঠোঙা খর্খর শব্দে পথ দেখিয়ে আমাদের আগে আগে চলে। আকাশে মেঘ। এর ওপর আবার বৃষ্টি নামবে নাকি?

অ্যালিস-এর ভাষায় 'ওয়ান্ডারফুলেস্ট!' বাংলো চত্বর থেকেই কাচের বন্ধ জানালার ভিতর দিয়ে আমি সুনীলকে দেখতে পেলাম। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র গ্রন্থকার ওই উপন্যাসের অন্যতম নায়ক লন্ডনপ্রবাসী আজীবন বন্ধু ভাস্কর দত্তর সঙ্গে, জোড়া চাঁদ হেন, সোফায় বসে আছে। হাতে চাঁদ পাওয়ার অনুভূতিই আমাদের মনে জাগে।

বারান্দার দরজা ভেজানো ছিল। ক্যাঁঅ্যাঁচ..... ঠেলে ঢুকেই একদম মুখোমুখি। ওদের তো বলা ছিল না যে আমরা যাব। কাজেই, যাকে বলে, রীতিমত নাটক। সুনীল কোনওকালেই তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে না— এক পড়ে-টড়ে না গেলে। ওকে পড়ে যেতে শেষবার দেখেছিলাম, আর সেটাই প্রথমবার। চাইবাসায় 'সাইকেল কি সাঁতার কেউ কখনও ভোলে ভাই' এই না বলে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইকেলে উঠেই দড়াম করে চিৎপাত। দর্শকের ভূমিকায় মধুটোলার সাত বোন পারুল! বলা বাহুল্য, লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল তক্ষুনি, আর তড়াক করেই।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনে হল তাকে, আপাদলম্বিত কাশ্মীরি শাল গায়ে ভাস্কর যখন উঠে দাঁড়ায়। 'খুব খুশি হলাম'— চোখে সুনীল বসে থাকে।

ওদের মাথার পিছনে চৌকো কোয়ার্টজ ঘড়িতে রাত তখন ন'টা। বাইরে সেই ধরনের শীত হাড়ে কাঁপুনি ধরাতে না পারলে যার মজা আসে না। আমি ভাইপোর 'হারা' জিন ও ভাইঝির বরের পুলওভার পরে আছি— ভিতরে গোপন উলিকট। পার্থর গায়ে জ্যাকেট।

'কী ব্যাপার, নর্থ পোল থেকে নাকি?' সুনীল ঠাট্টা করে বলে।

যা হয়, এটুকু উস্কানিতেই হ্যা-হ্যা, হোঃ-হোঃ হিঃ-হিঃ, হৈ-হৈ হাসি। হাসি আর থামতে চায় না। বিশেষত ভাস্করের। 'উউচ্' শব্দ করে ঈষৎ হেঁচকি তোলে। হাটখোলার দত্তবাড়ির আগমার্কা বনেদী হেঁচকি।

তবে আমরা এও না-বুঝে পারি না যে নিছক বে-কসুর ঠাট্টা নয়, কথাটার মধ্যে সুনীলের বেশ একটা উচ্চমন্যতাও থেকে গেছে। যেন বলছে, 'আর আমাকে দেখ দিকি!' সত্যি, এই শীতে সুনীল কিনা পরে আছে স্রেফ একটা রঙিন কাজ-করা গুরু-পাঞ্জাবি— উলিকট না হয় না থাকল, গায়ে একখানা স্যান্ডোও নেই! লেখালেখির লাইনে তো কারুকে দাঁড়াতে দিল না, যাকে বলে তৎসমে নিস্ক্ষত্রিয় এবং তদ্ভবে প্যান্টুল খুলে ছেড়ে দিল— তা পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও কি একটু 'পাস' দিতে পারত না। অবশ্য, দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে বোঝা গেল বুকখোলা পাঞ্জাবি পরে থাকলেও, সে আসলে সশস্ত্র। কেন না, তার পিঠের দিকে একখানা ধূসর খাপি তুষের শাল, যদিও ক্যাজুয়ালি, ঝোলানো রয়েছে। চতুষ্পদের থাবার মধ্যে নখ ঢুকিয়ে বাইরে ঘোরা-ফেরা করছে দ্বিধাগ্রস্ত শার্দূল এবং এখনও বাংলোর মধ্যে ঢুকতে সাহস পায়নি, তার প্রতি সুনীলের ভাবখানা: টিপেছ কি টিপেছি! অর্থাৎ, ট্রিগার। অর্থাৎ কিনা, একটুও শীত লেগেছে কি অমনি জম্পেশ করে শালখানা গায়ে জড়িয়ে নেব, হুঁ।

'কী খুব ঠাণ্ডা পড়েছে বাইরে, না?' সে এবার সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। যেন, ভেতরে পড়েনি! মনে হল তার গেঞ্জিহীন, বুক-খোলা গুরু-পাঞ্জাবি থেকে একটি সনাতন ভারতীয় সুতো কোনও-না-কোনওভাবে লজ্জাই দিতে চাইছে আমার আপস্টার্ট জিন ও পার্থর বিজাতীয় জ্যাকেটের প্রতিস্পর্ধী চামড়াকে। কিংবা, সুনীল হয়ত অতশত ভেবে কথাটা বলেইনি। কেন না, বক্সারের মারে বরাবর থাকলেও, কুস্তিগিরের প্যাঁচে তো সে বিশেষ পারদর্শী নয়! একবার তখন আমরা দু'জনেই দমদমে, দমদম রোডের ওপর, তখন মাঝরাত, সুনীল আমাকে মারবে বলে শাসিয়েছে, আর আমি, 'মারবে? আচ্ছা মারো?' বলে 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব গো' এমনি একটা সর্বংসহ রাবীন্দ্রিক স্টান্স নিয়েছি... 'তবে রে' বলে শূন্য রাজপথে সে কি বেধড়ক পিটুনি! বলা বাহুল্য, ওই আড়াই-প্যাঁচের দার্শনিক স্টান্সটা না নিলে সেদিন আমি মার খাই না। তখন সুনীলের একটা আমার-মতে-ভুল ধারণা ছিল যে, কারও নেশা ছুটিয়ে দেওয়ার একমাত্র মহৌষধ হল প্রহার, এমনকি নিজেকে। শ্যামবাজার মোড়ে নিজের নেশা ছোটাবার জন্যে যে সে কতবার ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের সঙ্গে ঝামেলা পাকিয়ে তাদের সমবেত প্রহারে রক্তাক্ত হয়েছে! সে-সময় ১৯৬০-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর প্রথম ক'টা বছর প্রায় প্রতিদিনই আমরা কলকাতার কোথাও-না-কোথাও 'রক্তকরবী'র নাইট শো করতাম। কফি হাউসের তরুণতররা বলত, "চল আজ নাইট শো-তে 'শ্যামবাজার বায় নাইট' দেখব।" তখন 'প্যারিস বায় নাইট', 'টোকিও বায় নাইট'— এমনি নামের মারদাঙ্গা ছবি খুব আসত।

শ্যামবাজার বায় নাইট

'শ্যামবাজার বায় নাইট' নাটকে প্রতিদিনই নতুন নতুন রক্তকরবী! রাত বারোটা নাগাদ শুরু হত। শক্তি আর শরতের মল্লযুদ্ধ আজও চোখের সামনে ভাসে। মাঘ মাসের শীতে শরৎ এক এক করে টাইপিন টু মোজা সব খুলে ফেলল, শক্তির গায়ে ছিল খুব দামি শাল একটা (নিজের নয়)— অবিলম্বে কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত হয়ে (আন্ডারউইয়ার) ঊরু চাপড়ে দু'জনে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে 'আও শালে', 'আও শালে' বলে আহ্বান— ঠিক যেমন কুস্তিগিররা রিঙে। ট্রফি ছিল দু'জনের অদ্বিতীয়া বান্ধবী। দর্শকের ভিড় মন্দ হয়নি। সবাই উৎসাহ দিচ্ছে— ঝাঁপিয়ে পড়! শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় রেফারির সিটিও দিচ্ছিল মাঝে মাঝে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ কারুকে ছুঁল না। শুধু চাপড়ে লাল করে ফেলল যে-যার ঊরু। যবনিকা পড়লে সেদিন শরৎ টাইপিন পর্যন্ত সবই পরে নিয়েছিল, তবে বেচারা শক্তি দামি শালটা আর খুঁজে পায়নি। অবশ্য সেটা ছিল পরের। ও গায়ে দিয়েছিল মাত্র। সুনীল আর আমি ছিলামই সেদিন— দর্শকদের মধ্যে আর কে কে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসবেন জানি না।

আসলে এই শ্যামবাজার ক্রসিংয়েই আমাদের হত ছাড়াছাড়ি। আর যত মারামারিও এখানেই। সুনীল আর আমি চলে যেতাম দমদমে, শরৎ হালদারবাগানে, শক্তি উল্টোডাঙায়— এই শ্যামবাজার মোড় থেকেই। যাওয়ার আগে একটু খেলাধুলো আর কী!

বিদেশি ঠিক নয়। বিজাতীয় পোশাক সম্পর্কে সুনীলের একটা রোখ ছিল। খুব মনে পড়ে, আরও পরে, সত্তরের মাঝামাঝি— পার্থ তখন হাওড়ার ডি এম— ওদের বাংলোয় ওর ছেলে লালনের ২/৩ বছরের জন্মদিনে আমি একটা পড়ে-পাওয়া টাই পরে গেছি, আর সেটা দেখে 'খুলে ফেল, খুলে ফেল শিগ্‌গির, ছিঃ' বলে সুনীল সর্বসমক্ষে আমার দিকে তেড়ে এসেছিল। লাল প্ররোচনা দুলিয়ে মাতাদোরের মতো মৃত্যু-শৃঙ্গের দিকে ওর ধেয়ে যাওয়ার ব্যাপার অনেকবার দেখেছি।

তাই বলছিলাম সুনীল হয়ত সাদামাটাভাবেই কথাটা বলে থাকবে যে, 'খুব ঠাণ্ডা পড়েছে বাইরে, তাই না?' বাকি সবটাই হয়ত আমাদের কমপ্লেক্স। দ্য উইয়্যারার নোজ হোয়ার দ্য শ্যু পিঞ্চেস, এছাড়া একে আর কী বলা যায়?

ঝাড়গ্রামে নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ বারান্দায় ওদের সঙ্গে সোফায় বসে তৃতীয় ব্যক্তি হলেন কন্ট্রাক্টর কল্যাণ বসু। সে যে থাকবে, এটা অবশ্য জানাই ছিল। প্রায় আড়াই যুগ ধরে আমাদের কাছে ঝাড়গ্রাম মানে কল্যাণ বসু, কল্যাণ মানে ঝাড়গ্রাম বসু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাতী ভেতরে ছিল, আমরা এসেছি শুনে বেরিয়ে এল।

ওদের সামনে মেঝেয় জুট কার্পেটের ওপর তিনটি বোতল। জল নয়, বোতলের মুখে আঁটা কাঁচা শালপাতার ছিপি বলে দেয়, ওগুলি মহুয়া। এখনও খোলা হয়নি। প্রায় ৩০ বছর আগের অরণ্যের দিনরাত্রিগুলির অন্তত একটিও ওদের ডাকে আর-একবার সাড়া দেবে, মনে হল, এমনটা আশা না-করেই হয়ত ওদের (মহুয়া) আনানো হয়েছে। অরণ্যের দিনরাত্রির অন্যতম নায়ক ভাস্কর দত্ত বিলেত থেকে সশরীরে হাজির। সেই নির্বাক যুগের ডায়ালগ-রাইটার সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় হাজির। তবু আশা নেই। কারণ, আলোকসম্পাতকারী দীপক মজুমদার আসেননি। সর্বোপরি, নেই পরিচালক শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ছবিঘরে, তাই, অন্ধকার।

বেশি রাতে কথায় কথায় সুনীল বলল, 'অরণ্যের দিনরাত্রি কিন্তু বিদেশে ফেমাস ছবি। আমাকে একবার আমেরিকায় এক ফিল্ম ইনস্টিটিউটে বলল, ফিল্ম আর গল্পের সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলতে। আমি জানতাম, অরণ্যের দিনরাত্রিকে ও-দেশে টেক্সট ফিল্ম হিসেবে দেখানো হয়। আমি বললাম, 'বেশ তো, আপনারা আগে ফিল্মটা দেখান। তারপর আমি না-হয় বলব। আমার কাজটাও বেশ সহজ আর ছোট্ট হয়ে গেল।'

কী বলেছিল সেখানে সুনীল, তা নিয়ে আর সেদিন কথা ওঠেনি। গঙ্গায় যখন জোয়ার, তখন আহিরীটোলা ঘাটে নেমে সাঁতার দিয়ে ঠিক ওপারে তেলকল ঘাটেই উঠব, এমনটা আশা করা যায় না। মদ, বিশেষত মহুয়া, কোনও ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। তাই, প্রসঙ্গান্তর এসে পড়েছিল সঙ্গে-সঙ্গেই।

যদিও একই প্রসঙ্গে ইউ এস আই এসের লিঙ্কন রুমে আহূত এক সভায় সুনীল যা বলেছিল, তা মনে পড়ে। মনে হয়, কী অরণ্যের দিনরাত্রি, কী প্রতিদ্বন্দ্বী— উভয় ছবিতেই নিজেরে হারায়ে খুঁজে সুনীল শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েছিল খুবই। 'চলচ্চিত্র যদি এতই সাবালক, তবে অন্যের কাহিনী অবলম্বন করে কেন? স্রেফ একখানা ক্যামেরা নিয়ে সাদা পর্দার দিকে এগিয়ে গেলেই তো পারে! যেমনটা পেন্টার যায় ব্রাশ হাতে ক্যানভাসের দিকে?' সে এমনটাই কিছু বলেছিল বা বলতে চেয়েছিল সেদিন, যদিও ভাষাটা আপাতত আমার। প্রসঙ্গত, কিছুদিন হল রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ছাপা হয়েছে (দ্রষ্টব্য, অরুণ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র')। তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে কতকাল আগে, তখন নির্বাক যুগ, যে, যতদিন চলচ্চিত্র সাহিত্যের ওপর নির্ভরশীল থাকবে, ততদিন এর সাবালক হওয়ার আশা নেই। (ভাষা আমার)। কী অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী!

যাই হোক, যে কারণে এই ঝাড়গ্রাম প্রসঙ্গ। টিভি-তে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' দ্বিতীয়বার দেখে (না-দেখে) আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগল না। অথচ, সেই কবে ১৯৯৫ থেকে যখনই সুযোগ পেয়েছি, 'পথের পাঁচালী' দেখে গেছি। মনে পড়ে, সূর্যগ্রহণের দিন টিভি-তে সারাদিন ধরে খেপে খেপে 'পথের পাঁচালী' দেখা। যতবার দেখেছি, প্রতিবারেই মহত্তর মনে হয়েছে। সূর্যগ্রহণের দিন তো মহত্তম বলে বোধ হল। তারপর আর দেখিনি। সেদিন মনে হয়েছিল, মানুষের মনে যতদিন চলচ্চিত্র-জিজ্ঞাসা থাকবে, ততদিন অন্তত বর্ণ-পরিচয়ের কারণে পৃথিবীর নব নব প্রজন্মকে এই একটি ছবির দ্বারস্থ হতেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিভি-তে এবার অনেকটা দেখে মনে হল, তুলনায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছিল ঢের ভাল।

অবশ্য, সত্যি বলতে কি, সুনীলের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' পড়েও খুবই অপ্রস্তুত বোধ করেছিলাম। আমাদের সেই সব রক্তমাংসময় অরণ্যের দিন ও রাত্রিগুলি নিয়ে আমাদেরই মধ্যে কেউ এভাবে লিখবে, এজন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। অন্তত সুনীলকে তো কেউই সন্দেহ করিনি। বরং, দলে ব্ল্যাকশিপ বলে কারুকে যদি সন্দেহ করা হয়ে থাকে, তবে সে আমি। কারণ হংসমধ্যে শুধু আমিই ছিলাম বক— অর্থাৎ গল্প-লেখক। যদিও সুনীলের 'যুবক যুবতী'রা নামে একটি উপন্যাস 'উত্তরতরঙ্গ' নামে লিটল ম্যাগাজিনে তখন খানিকটা বেরিয়েছিল— কিন্তু পত্রিকাটি তো কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। আর 'আত্মপ্রকাশ' মনে হয়েছিল, নেহাতই কবিকে দিয়ে উপন্যাস লেখানোর একটি গিমিক- প্রয়াস মাত্র। কবি যখন সেটাই তার প্রথম আর শেষ উপন্যাস হবে, এমনটা আশা করা গিয়েছিল। যেমনটা নাকি অন্য কবিদের দিয়ে উপন্যাস লেখানোর চেষ্টার ক্ষেত্রে সবসময় হয়েছে। কবি হল একমনি বাটখারা— একমন তুলোর বস্তার ওজন হয় যা দিয়ে। সে কি আর ছাদে বসে, ধুনুরি হাতে, তুলো ধোনে? পুলিসেও অভিনেতা হয়, ডাক্তারে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, কিন্তু, কবি আবার উপন্যাস লেখে নাকি? শুধু বাংলাদেশে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও এমন নজির নেই। এদিক থেকে সুনীল বিশ্বরেকর্ড। বিশেষ করে, 'কতই তো দিলে বিধি— চোখ, নাক, হাত, ডিগ্রি, জিভ, ঘোরাঘুরি/কয়েকখানা বড়ো সাইজ উপন্যাস শেষ করার সামর্থ্য দিলে না'-র মতো মারাত্মক, চরম শ্লেষাত্মক চাবুকের শিস যে শুনিয়ে গেছে, কে তাকে ট্রয়ের ঘোড়া ভাববে! ওর আর একটি পঙ্‌ক্তিও আমার জীবনে চোরাবালির ভূমিকা নিয়েছে এবং আমি তাতেই ডুবেছি আর সেটা হল: কিছু টাকা জমা আছে ব্লাড ব্যাঙ্কে....। আরও একটি পঙ্‌ক্তি হল, 'আমার কিছুটা দেরি হয়ে যায়, জুতোয় পেরেক ছিল।' এই তিনটি ব্যর্থতা আমাকে আজও সমানভাবে সতেজ রাখে।

কেউ কথা রাখেনি? একশোবার। কেউ না। সুনীলও না।

তবে সুনীল যে খুব মহৎ প্রেরণা থেকে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বইটি লিখেছিল তা নয়। হয়েছিল কী, সেই সময় সুনীলের ধারণা হয়, 'বাংলা ছোটগল্প এবং কবিতা আপৎকালীন আত্মীয়স্বজনের মতো কাছাকাছি সরে আসছে' এবং এটা স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। একই দিনে তাই কৃত্তিবাসের একটি পদ্য ও একটি গল্প-সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া দরকার। পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা একই প্রচ্ছদ ভিন্ন রঙ বিন্যাসে ছাপা হয়ে একসঙ্গে দু-দুটি কৃত্তিবাস অবিলম্বে আলোকিত করল পাতিরামের স্টল। আমাদের মনে হল ঝলমল করছে সারা কলেজ স্ট্রিট।

গল্প-সংখ্যায় বেরুল দুটি বড় গল্প। কমলকুমার মজুমদারের 'ফৌজ-ই-বন্দুক'-এর পাশে আমার 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী'। জীবনে পুরস্কৃত হওয়ার আনন্দ সেই শেষ। এবং প্রথম।

'রিগ্যাল' সিনেমার গায়ে ছিল একটি প্রশস্ত রেস্তোরাঁ (এখন হোটেল শালিমার)। গায়িকা নীতা বর্ধনের দাদা ছিলেন ম্যানেজার। অন্তত তিনি তাই বলেছিলেন। নীতা বর্ধনের রেকর্ড ছোটবেলার অনুরোধের আসরে প্রায়ই বাজত। তাঁর একটি গানের কলিও মনে পড়ে: যে ব্যথা দিয়ে গেলে....।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে তাঁকে যে মনে আছে, তা তাঁর ওই রেস্তোরাঁর ম্যানেজার-দাদার ভগিনী হিসাবেই। কলকাতায় ওই একটি রেস্তোরাঁতেই কোনও সাইনবোর্ড ছিল না, এবং কারণবশতই। সারাদিন রেস্তোরাঁটি পড়ে পড়ে ঘুমাত। সন্ধ্যার পর ঘন পর্দা-ঢাকা কেবিনে সবান্ধবে বসে কালো কিংখাব থেকে গম্ভীর গুপ্তির মতো শক্তি টেনে বের.করত তার জমকালো গলা, ডাকত:

'বিজঅঅয়!'

সেই একডাকে ছদ্মবেশী রেস্তোরাঁটি পরিণত হয়ে যেত কৃত্তিবাস বার-এ।

বিজয় চার-পাঁচটি গ্লাস (যেদিন য'জন) ও একটি রামের বোতল রেখে যেত।*

শক্তির অবগতির জন্য এখানে সানন্দে জানাই আমাদের সেই কৃত্তিবাস বার-এর জীবন্ত মেমেন্টো হিসেবে 'বিজয়' এখনও বেঁচে আছে। আশ্চর্য, অবিকল একরকম দেখতে আছে তাকে। সেই ইনফ্যান্ট দ্য টেরিব্‌ল-এর সর্বজ্ঞ, আবিল, চোরা হাসি। রক্সির সামনে রিজেন্ট রেস্তোরাঁয় সে এখন ভেজিটেবল চপ সার্ভ করে।

কৃত্তিবাস-এর একদিনে দু-দুটি সংখ্যা যেদিন বেরল, মনে পড়ে, নীতা বর্ধনের দাদার রেস্তোরাঁয় সেদিন মধ্যরাত্রি পার করে 'বিজয় উৎসব' চলেছিল।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ওঃ হো, এভাবে ডাইগ্রেস করতে করতে কখন যে তেলকল ঘাটে পৌঁছব তা জানি না, জানি না আদৌ কোথাও পৌঁছব কিনা। তো, কৃত্তিবাসের সেই স্বপ্নে- দেখা একই দিনে দুটি সংখ্যা তো বেরুল। কিন্তু এর না-জানি কত না করুণ ইনসাইড স্টোরি ছিল। সংখ্যা দুটি তো বেরুল। কিন্তু এত টাকা এল কোথা থেকে? সুনীলের টিউশনির টাকায় বা ভাস্কর দত্ত কি আশুতোষ ঘোষের সার্জারিতে তো এ যমজ ভূমিষ্ঠ হওয়ার নয়! অবশ্য পরের পর 'কৃত্তিবাস' ছাপার টাকা সুনীল কোথা থেকে পেত, সে এক রহস্য। আমরা তো শুধু লেখা দিয়েই ধন্য করতাম। 'জলসা' পত্রিকার চিত্ত সরকার বার- দুই 'কৃত্তিবাস' ছেপে দেন কিন্তু বিল মেটাবার সামর্থ্য সুনীলের ছিল না। 'জলসা'র পুজো সংখ্যায় বাধ্য হয়ে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাসটি লিখে দিয়ে যাকে বলে গায়ে-গতরে সুনীল ঋণমুক্ত হয়। প্রতিটি 'কৃত্তিবাস' বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে এমনি কত না অন্তর্কাহিনী লুকিয়ে আছে! যুবক পিকাসো সিফিলিস-মুক্ত হওয়ার জন্য প্যারিসের এক ডাক্তারকে ইঞ্জেকশন-প্রতি একখানা করে ছবি এঁকে দিতেন। সে তুলনায় অবশ্য এ আর এমন কী। যাই হোক, 'অরণ্যের দিনরাত্রি' রচনার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু ওই একটাই। চিত্ত সরকার। সত্যজিৎ রায় নন।

যা বলছিলাম। হয়ত বইটি ভালই লিখেছিল সুনীল— অরণ্যের দিনরাত্রি! কিন্তু আমাদের 'জঙ্গলের দিনরাত্রি'র সঙ্গে তার জাতে মিল ছিল না বলেই হয়ত তত ভাল লাগেনি। হয়ত সত্যজিতের ফিল্মটিও ফিল্ম হিসেবে ভাল। হয়ত এবারেও খারাপ লাগল আমাদের দিনরাত্রির সঙ্গে আবার তার বিন্দুমাত্র বা কোনওরূপ মিল খুঁজে পেলাম না বলেই।

---

* তখন ১ বোতল এরোপ্লেন রাম ১৬ টাকার মতন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যজিৎ অবশ্যই বলতে পারেন না যে, 'আমি তুলেছি আমার অরণ্যের দিনরাত্রি। এর সঙ্গে সুনীলের বা তোমাদের অরণ্যের দিনরাত্রির সম্পর্ক কী।' সম্পর্ক যে আছে, ওই কাহিনী 'অবলম্বনে' যে ছবিটি তোলা, তার স্বীকৃতি তো টাইটেলেই আছে। ঠিক যেমন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলতেই পারেন যে, 'তোমাদের দিনরাত্রি নিয়ে আমি লিখেছি কে বলল? তোমাদের অরণ্যের দিনরাত্রির মতো হয়নি তো হয়নি। ওই ওদের মতো তো হয়েছে, যাদের নিয়ে লিখেছি।' সেক্ষেত্রে বলার কিছুই থাকে না। কারণ, সুনীলের উপন্যাসে কোনও ঋণ স্বীকার নেই যে শক্তি সুনীল দীপক শরৎ কি ভাস্কর দত্ত অবলম্বনে রচিত।

তবে সে যাই হোক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' যখন শারদীয় 'জলসা'য় প্রথম পড়ি (১৯৬৬), তখন যেমন সত্যজিতের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' দেখেও, আবারও আমাদের জঙ্গলের দিনরাত্রির কথা দীর্ঘশ্বাস-সহ মনে পড়ল। কথাপ্রসঙ্গে সুনীল যদিও কয়েকবারই বলে রেখেছে যে, ওর 'অরণ্যের দিনরাত্রি' মূলত ধলভূমগড় এপিসোড নিয়ে যা আরও ক'বছর পরের কথা এবং সেবার আমি ছিলাম না, ছিল শরৎ (কুমার মুখোপাধ্যায়), ভাস্কর দত্ত, এরা সব। তবু তার আগের বিভিন্ন দিনরাত্রি এপিসোডে এবং সেগুলিও অরণ্যের, শক্তি, দীপক, আমি ছিলামই। সুনীল ছিল। এবং আমাদের সেই সব জঙ্গলের দিনরাত্রিগুলি নিয়ে কিছু বলার হক আমাদের তাই থাকলে আছে।

এমনি একটি এপিসোড হল আমাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হেসাডি-অভিযান। আমার তৃতীয়বারের সঙ্গী ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার এবং সুবোধ বসু (যুগান্তর)। শক্তি? বা, সেবার হেসাডিতে শক্তিই ছিল সবচেয়ে বেশি করে, যেভাবে গাছের পাতায় থাকে 'ঝিকিমিকি' (আর একটু হলেই 'সময়' লিখে ফেলেছিলাম)।

তার আগে, দ্বিতীয়বারে যাই শক্তির সঙ্গে। শক্তি আর সুনীল পাল নামে একজন, যাওয়ার দিনেই শেষোক্তর সঙ্গে কফিহাউসে কফি পান করতে করতে বিকেলে আলাপ। সেই রাত্রেই সে আমাদের সঙ্গে সম্বলপুর প্যাসেঞ্জারে! উদ্দেশ্য হেসাডি, ভায়া চাইবাসা। চাইবাসায় থাকে সুনীলের বন্ধু সমীর রায়চৌধুরী, ফিশারিজের ইনস্পেক্টর। ট্রেনে শক্তি আমাকে জানায়, সুনীল (পাল) কয়েক বছর আগে শেষ ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রথম স্কুল ফাইনালে ফার্স্ট হয়েছে। বোধহয়ত ফিফটি টু-তে। আনন্দবাজার পত্রিকায় তদুপলক্ষে ছাপা তার ছবিটি ছিল মনে রাখার মতো; অসুস্থ মাকে সুনীল পাখার বাতাস করছে!

সে তখন উত্তরপাড়া কলেজের লেকচারার, যখন আমরা যাই।

এখন সে আমেরিকায় কচ-জাতীয় এমন গুরু-মারা বিদ্বান যে দেশে ফেরার আর পথ নেই।

যাই হোক, এখানে তিনটি 'বলাবাহুল্য' প্রথমেই বলে নিই?

১: বলাবাহুল্য, বাড়িতে কোনওরূপ সংবাদ পাঠাবার প্রয়োজন আমরা কেউই বোধ করিনি।

২: আমার কাছে ৬০ টাকা এবং শক্তির কাছে ছিল তৎকালীন কিছু-না। বলাবাহুল্য, আমরা যাচ্ছিলাম সুনীল পালের সে মাসের মাইনের ভরসায় (১৫০ টাকা) যা সে সেদিনই পেয়েছে এবং যা থেকে একটি মুরগি-ঠ্যাঙের রোস্ট এবং তিন কাপ কফির দাম সে এখনও পর্যন্ত খরচ করতে পেরেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩: বলাবাহুল্য, সমীর রায়চৌধুরীকে আমরা চিনি না।

'চলো বেড়িয়ে আসি' বা এমনি কোনও নামের একখানা বই আমাকে উৎসর্গ করতে গিয়ে শক্তি যে তার নিচে আমাকে 'নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রথম সঙ্গী' বলে ঘোষণা করেছিল, আজ মনে হয়, সে কী আর এমনি-এমনি!

প্রথম হেসাডি

এ-সব ১৯৫৯ সালে অক্টোবর মাসের কথা। তবে হেসাডিতে আমি প্রথম যাই তারও আগে। আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের বন্ধু দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে (সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ নন)। 'প্রথম যাই' না বলে হেসাডিকে 'প্রথম দেখি' বলাই ঠিক। ১৯৫৪ সালে বি এ পরীক্ষা দিয়েই আমরা বোধহয় রাঁচি গিয়েছিলাম। ভুল ট্রেনে ওঠার জন্য চক্রধরপুরে আমাদের টেনে নামিয়ে দেয়। পরদিন ভোরের বাসে রাঁচি যাওয়ার পথে পর্বতচূড়ায় প্রথম হেসাডির বাংলোটি আমি দেখি। দূর থেকে দেখতে দেখতে আমি হেসাডির প্রেমে পড়ে যাই। কুয়াশায়, রোদ্দুরে, উঁচুতে-নিচুতে... পাহাড়ি চড়াই-উৎরাই ধরে যেতে যেতে সে কতবার কতরূপে যে তাকে দেখলাম! এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে জল নিতে বাসটি কিনা হেসাডির বাংলোর গায়ে থামল! আজও মনে পড়ে কী সুন্দর নাম ছিল বাসটির। কী নাম? না, 'লাভ্‌লি কোচ।'

সোয়েটার-চাদর গায়ে বাস থেকে আমরা হেসাডিতে নামলাম থাকব বলে। লাল টুকটুকে, খাপরা টালির বাংলোটিও পাওয়া যাবে জানা গেল। কিন্তু, শেষ মুহূর্তে কী ভেবে যে দীপেন ব্যাগ-ট্যাগ তুলে বাসে উঠে পড়ল! যেতে যেতে আমি যখন ঘন সেগুন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেসাডির ঝর্নাটিও দেখতে পেলাম, তখন হাতে-পায়ে ধরে আমি দীপেনকে বলেছিলাম, নেমে পড়তে। সত্যি, তখন কী অসম্ভব ভয়াবহ সৌন্দর্য ছিল হেসাডির! বাঘ বেরুত বলে নয়। বুনো হাতির পাল আসত, সে জন্যও না। সাদা সাদা পোলকা-ডট হরিণের হলুদ চামড়া পরে ভোরের কুয়াশার মধ্যে প্রতিদিন আবির্ভূত হত এক চিত্রল সৌন্দর্য, বাংলোর জানালার শার্শিতে শিঙ ঘষত। সেই কারণে।

পাহাড়ি ঘাট-রাস্তা ধরে যেতে যেতে ঘুরে-ফিরে বার বার দেখা দিচ্ছিল হেসাডির ঝর্না। উচ্চতায় হুড্রুর চেয়ে কম তো হবেই না, বরং বেশি। যদিও জল-তোড় হুড্রুর চেয়ে ঢের কম এবং গর্জন। ('ও ঝর্না/ও গো ঝর্না/তাহাকে ভালবাসবে কি/ভালবাসবে কি'— সারঙ্গ: শক্তি চট্টোপাধ্যায়)।

একটা কালো শ্লেট পাথরের দু'ধার দিয়ে দুটি ঝিরিঝিরি ধারা নেমে এসেছে। ঠিক যেন দু'বেণী ঝোলানো একটি ওঁরাও যুবতীর পিঠ। ঝর্না দেখে, বিশেষত আমার এই উপমাটি বলামাত্র দীপেন উঠে পড়ল। বলাবাহুল্য (চার), সে ছিল ঈষৎ কামকাতর। বেল-টেল মেরে আমরা বাস থামিয়ে শেষ পর্যন্ত নেমেই পড়লাম।

মাইলচারেক পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আমরা হেসাডি ফিরে এলাম। ঝর্নাটি যেখান থেকে পড়ছে সেটাই বাংলো থেকে সবচেয়ে কাছে। আমরা সেখানেই গেলাম। যদিও ঝর্নার পাদদেশে দাঁড়ানোই নিয়ম। খুব বেশ লাগছে এবং আমরা এক রকম ঠিক করেই ফেলেছি যে এখানেই তাহলে দু-একদিন থেকে যাব, এমন সময় দীপেনের চোখ আমার চোখের দিকে তাকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু দুটি চাউনির বিনিময় এবং তার ভাষা হল এই: গন্ধটা চেনা-চেনা লাগছে না? চিড়িয়াখানায় কোনও বিশেষ খাঁচার সামনে... আমাদের দু'জনের একটি প্রাণীর কথাই মনে হচ্ছে আমরা টের পাচ্ছি— এমন সময় একটা ঝোপ নড়ে উঠল। সেই টার্জনের আমলের জঙ্গল, আন্ডারগ্রোথ এত বেশি যে কিছু বোঝা দায়। কিন্তু গন্ধটা আমরা নিঃসন্দেহে চিনেছি। এর পরে কী? হলুদ ডোরাকাটা লাফ?

বুক পকেটে প্রাণ, পায়ে পায়ে আমরা বাংলোয় ফিরে এলাম। বাংলোর তরুণ চৌকিদার (তখন দুর্গা) জানাল, 'হ্যাঁ, বাঘ এখানে আছে। তবে মানুষ ধরবে এতটা বুড়ো সে এখনও হয়নি।' 'তাছাড়া', সে আরও বলল, 'অনেকে বলে সে নাকি আসলে একটা দেবতা। বাঘের রূপ ধরে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। অনেকেই দেখেছে। চোখ দুটি তার এই বড় বড় আর ঠিক মানুষের মতো।' আড়াই হাজার ফুট উঁচু বাংলোর আলমারি থেকে দামি ক্রকারি ডাইনিং টেবিলে সাজাতে সাজাতে চৌকিদার আরও বলল, 'তবে ভয় নেই। সে এখনও গেরস্থর একটা ছাগলও নেয়নি।' মুরগিও তাকে ভয় পায় না, সে জানাল।

দুর্গার হাতে মুরগির ঝোল খেয়ে দীপেন কিন্তু জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল। কী ব্যাপার! দুপুর দুটোয় দিনের দ্বিতীয় এবং শেষ বাস। কিন্তু সে বাস তো খুঁটি পর্যন্ত যাবে? তা যাক, দীপেন খোঁজ নিয়েছে, ৩০ মাইল দূরে খুঁটিতেও একটা ডাকবাংলো আছে। চৌকিদারের নাম জলু সিং। দুর্গার কথা বললে, একটা রাত্তির সে নিশ্চয়ই থাকতে দেবে, দুর্গা ভরসা দিয়েছে। দীপেন এখানে কিছুতেই সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাবে না। কেন না, অন্তত এখানে, বাঘের ভয়ের সঙ্গে সন্ধ্যার একটা সম্পর্ক আছেই, সে বুঝতে পেরেছে।

সে রাতে খুঁটির বাংলোয় বসে খুব রাগারাগি হয়েছিল আমাদের। গালিগালাজ হয়েছিল। অবশ্য গালিগালাজ বলতে তখন আর আজকালকার তুলনায় কী। বড়-জোর শালা আর বানচোৎ।

মানুষের কী যে মনে পড়ে। আর কী যে পড়ে না। মনে পড়ে, খুঁটিতে শেষ বিকেলের সেই শারদীয় হাট। হাজারখানেক আদিবাসী। তবু পিন-পতনের নীরবতা। সেকালের 'নর্টন' মোটর সাইকেলে বসে তরুণ কন্ট্রাক্টর সারবন্দী কুলি-কামিনকে তখনও 'হপ্তা' দিচ্ছে। দু'বেণী ঝোলানো এক কালো শ্লেট পাথরের বিশ্বসুন্দরীকে কত সময় ধরে যে 'হপ্তা' দিল! কত হাসি-মস্করা করল দু'জনে ওঁরাও ভাষায়। বুক জ্বলে যাচ্ছিল।

হাটের প্রান্তে শালপাতার ঠোঙায় আরও হাঁড়িয়া খেতে খেতে দেখি, আর-এ, যে ঢেলে দিচ্ছে, এ তো সেই কন্ট্রাক্টরের মেয়েটা না? কিছু দরকারি ওঁরাও ভাষা আমি বাসেই জেনে নিয়েছিলাম। বাস্তবিক ক'টাই বা কথা লাগে মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে! 'আপনার নাম কী', 'কোথায় থাকেন', 'বনলতা সেন' হলে 'এতদিন কোথায় ছিলেন', কিংবা বড়-জোর 'সুন্দর দেখাচ্ছে'— এই তো? আমি তিনটিই জানি ওদের ভাষায়। ততক্ষণে বলতে পারি।

'কুতা তেন হিজু তানা?'

আমি শুরু করেছিলাম দ্বিতীয়টি দিয়ে।

অর্থাৎ, 'আপনি থাকেন কোথায়?'

মেয়েটি বলেছিল, 'টুমাং ডুং রি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীকণ্ঠে মাদলের সেই টঙ্কার আজও রক্তে বাজে।

দূরে? না কাছে। হুই পাড়াটার নিচে, মাইল চারেক দূরের একটা পাহাড় দেখিয়ে সে বলেছিল।

'বনু ভিগি।' আমি তাকে বলি।

পাঠিকা ভাবছেন এর মানে বুঝি, 'তুমি খুব সুন্দর!' তা কিন্তু নয়। ঠিক উল্টো। এর মানে হল, তোমাকে বিচ্ছিরি দেখতে। শুনে জিভ ভেঙিয়ে আর উদ্ভাসিত হেসে সে আমাকে বলে, 'তুমি বিচ্ছিরি।'

চলচ্চিত্রের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' দেখে অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন ওই শমিত ভঞ্জটি কে? মানে, যার সঙ্গে সিমি-অ্যাফেয়ার আর কী! এ ব্যাপারে বলতে পারি, ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে আমি যে মিনিবুকগুলি বের করতে থাকি, তার দ্বিতীয়টি ছিল আমার দ্বারা নির্বাচিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ১৬টি কবিতার একটি সঙ্কলন। নাম: লাল রজনীগন্ধা। সুনীলের 'লাল' কবিতার সঙ্কলন, তাই অমন প্যারাডক্সিকাল নাম দিয়েছিলাম। ওই মিনিবুকটি সুনীল উৎসর্গ করেছিল এইভাবে:

'অরণ্যের দিনরাত্রি'র বাস্তব নায়ক
দীপক মজুমদারকে

দ্বিতীয় অভিযান

শেষ ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রথম স্কুল ফাইনালে ফার্স্ট সুনীল পালের কথা আগে বলেছি। শক্তি যখন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের দোতলার ব্যালকনিতে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, খুব মনে পড়ে সে তখন আস্ত মুরগি-ঠ্যাঙের রোস্ট খাচ্ছিল। আমি ছয় ভাই (একজন পিসতুতো) তিন বোনের সংসারে জার্ডিন হেন্ডারসন কোম্পানির কেরানির ছেলে, তখনও একটা আস্ত ডিম খাইনি। অতএব, মনে থাকার মতোই দৃশ্য।

আমাদের জন্যে কফি এলে সুনীলকে (পাল) শক্তি বলল, 'কাল থেকে তো বড়দিনের ছুটি, ক'দিন চাইবাসা ঘুরে এলে কেমন হয়।'

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সে প্রয়োজন বোধ করেনি। সেটা ১৯৫৯ সাল। আমি কলকাতা কর্পোরেশনে সবে চাকরিতে ঢুকেছি। ঢুকেই বাড়ির সঙ্গে মিথ্যে ঝগড়া করে শিয়ালদহের কাছে ২৪-বি নুর মহম্মদ লেনের একটি রাস্তার ধারের চুনকাম-করা প্রাক্তন রান্নাঘরে ৩০ টাকা ভাড়ায় থাকি। স্যাক্সবিতে কাজ করতে যায়, এই মর্মে শক্তি রোজ দশটায় আমার ঘরে এসে ওঠে এবং টাই-ফাই খুলে রেখে পাক্ষিক কাচা হয় এমন আন্ডার উইয়ার পরে খালি গায়ে, বিছানায় উপুড় হয়ে পা নাচায়। উপুড় হয়ে শুয়ে পা নাচানো ওর পদ্য লেখার একমাত্র সিম্পটম ছিল তখন (না জানি, এখন কীভাবে লেখে।) 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ'র অনেক কবিতাই ওই ভাবে লেখা, অর্থাৎ, বিছানায় শুয়ে লেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপ্রাসঙ্গিকও একটি প্রসঙ্গ। সে হিসেবে এখানে বলে নেওয়া যায়, বিছানাটি ছিল আর জি কর হাসপাতালের একটি ভাঙা বেড ছাড়া আর কিছু না, যা পুরু তোশকসুদ্ধ ঠেলাগাড়িতে চড়ে এখানে নীত হয়েছিল। মনে পড়ে, বেডটি ধোয়া মোছা হবে বলে একতলার বারান্দায় বের করে দেওয়া হয়েছিল, তখনও লাল কাপড়ে ঘেরা, শেষ শয্যা থেকে মৃতদেহটি সবে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শক্তি আর আমি হই হই করে শিয়ালদহ পর্যন্ত ঠেলার সঙ্গে দৌড়ে এসেছিলাম।

এখানে শক্তির সঙ্গে তখন আমার সম্পর্কটা কেমন ছিল তারও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আমি সবে চাকরিতে ঢুকেছি। পরি ধুতি-পাঞ্জাবি। একবার মাইনের দিন একটা কোলাপুরি চটি কিনে ও পুরনোটা ফেলে দিয়ে (আমার বরাবরের অভ্যাস) ঘরে ঢুকে দেখি, শক্তি খালি গায়ে উপুড় হয়ে শুয়ে। যথারীতি তার পা নড়ছে। সামনে কাগজ-কলম। পায়ে নতুন চটি দেখে শক্তি খুব ভর্ৎসনা করেছিল। মিছিমিছি কেন পয়সা নষ্ট, ছি-ছি। শক্তির অনুমতি না নিয়ে একটা গেঞ্জিও কেনার অধিকার আমার ছিল না।

বিকেলে আমরা যেতাম কফিহাউসে। কফিহাউসে ৯টা পর্যন্ত। তারপর কোনওদিন গোলদিঘির ইউনিভার্সিটি এন্ডে, কোনওদিন দেশবন্ধু পার্কে আমাদের আড্ডা জমত মধ্যরাত পর্যন্ত। কফিহাউস থেকে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত আমরা অধিকাংশ দিনই যেতাম কোরাসে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে। দলে থাকত সুনীল, শক্তি ছাড়াও দীপক মজুমদার, তন্ময় দত্ত, শরৎকুমার ও প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, যুগান্তরের সুবোধ বসু, লন্ডনপ্রবাসী ভাস্কর দত্ত, অধুনালুপ্ত সুনীল রায় প্রমুখ অনেকেই। মনে রাখতে হবে তখন আমরা ২২ থেকে ২৫-এর মধ্যে।

তো, কফিহাউসে শক্তি ওই বক্তব্য রাখল সুনীল পালের কাছে। যে, 'চলো বেড়িয়ে আসি'। তা, চাইবাসা? সে আবার কোথা। ওই রাঁচির দিকে। উঠব কোথায়? গতকালই দেশবন্ধু পার্কের আড্ডায় শক্তির সঙ্গে আলাপ হয়েছে সমীর রায়চৌধুরীর, সুনীলের (গঙ্গোপাধ্যায়) খুব বন্ধু। পাটনার ছেলে। চাইবাসায় পোস্টেড, ইনস্পেক্টর অফ ফিশারিজ। সম্বলপুর প্যাসেঞ্জারে সে আজ রাতের গাড়িতে ফিরছে, সব ব্যবস্থা পাক্কা, সমীর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা ওখানে পৌঁছলেই হল। বাকিটা সমীর দেখবে। এমনই কথা হয়েছে।

তখন সন্ধেবেলা। ট্রেন সাড়ে আটটায়। শক্তির নির্বন্ধাতিশয্যে সুনীল পাল ও সুবোধ বসু রাজি হয়ে গেল। আমার মতামত নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। খামের সঙ্গে ডাকটিকিটের সম্পর্ক তখন আমার আর শক্তির। বাড়িতে খবর দেওয়ার কথা কেউ তোলেনি, আগেই বলেছি। কার কাছে কী পয়সাকড়ি, সে প্রসঙ্গ ওঠেনি। শক্তি জানে, সুনীল পাল সেদিনই মাইনে পেয়েছে।

এখন দরকার শুধু একটি ট্যাক্সির। স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছনো নিয়ে কথা। তারপর তো সমীর। কী যেন পদবি? ও হ্যাঁ, রায়চৌধুরী।

কলকাতার সব ট্যাক্সির একটা কান আছে। আর ওটা পাকড়াতে আমিই সবচেয়ে ভাল পারি। আমি কান ধরে একটা ট্যাক্সি টেনে আনলাম।

ট্যাক্সিতে উঠে শক্তি বলল, 'এসপ্ল্যানেড।'

কার্জন পার্কের উল্টো দিকে এসপ্ল্যানেড স্টোর্স থেকে কেনা হল এক কেস বিয়ার। আমাদের খরচ-খর্চা বলতে এই শেষ। কারণ, সমীর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু সময়মত পৌঁছনো নিয়ে কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুটের মাথায় বিয়ারের ঝাঁকা, প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেখা গেল হলুদ আলো জ্বলে আছে, ইঞ্জিন পর্যন্ত ছুটেও সমীর রায়চৌধুরীকে পাওয়া গেল না। সবুজ ফ্ল্যাগ উড়েছে, হুইশিল বেজে উঠেছে, ততক্ষণে নাট-বোল্টু-পিস্টনের ঝনাৎকার, বগিতে বগিতে ঠোকাঠুকির শেষে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। বিয়ারের ঝুড়িটা নিয়ে শক্তি কামরায় উঠে পড়ল, তারপর আমি, তারপর সুনীল পাল, তার মানিব্যাগ-সহ। সুবোধ বসু উঠল না বা উঠতে পারল না। ট্রেন থেকে শক্তি সুবোধের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, 'কুলিকে পয়সাটা দিয়ে দিস।' আমার খুব ভাল মনে আছে, 'বাড়িতে খবর দিস' এ-কথা শক্তি বলেনি।

ট্রেনে বসার জায়গা পেলাম। মুখোমুখি। তারপর খেয়াল হল আমরা টিকিট কাটিনি এবং বোতল খোলার চাবি আনিনি। দ্বিতীয়টির জন্য আমাদের আপসোস হল বেশি। তবে একটা কথা আছে যে, 'বোতল দেছেন যিনি, ছিপি খুলবেন তিনি।' শেষ পর্যন্ত সবক'টি বোতলের ছিপিই বাথরুমের দরজায় একটি নবাবিষ্কৃত খাপে-খাপ গর্তের সাহায্যে খোলা সম্ভব হয়েছিল।

ভোর হল রাজাখার্শোয়াং স্টেশনে। ঘন কুয়াশার মধ্যে ইংলিশ কটেজ টাইপ ছোট্ট স্টেশনটি হঠাৎ দেখা গেল। আমাদের এখানেই গাড়ি-বদল করতে হবে।

ডিসেম্বরের শেষাশেষি। হাড়-কাটা শীত। আমি আর সুনীল পাল তখন ধুতি-পাঞ্জাবি পরতাম, আমাদের গায়ে সোয়েটারের ওপর চাদর। শক্তি প্যান্ট-শার্টের ওপর একটি হাফ-স্লিভ পরে আছে। প্ল্যাটফর্মে নেমে আমার প্রথমেই মনে পড়ল রাতে বিয়ার ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি। আমরা তাই প্রথমেই সেই দিকে এগিয়ে যাই যেখানে উঁচু উনুনের ওপর জিলিপি ভাজার আয়োজন ততক্ষণে সম্পূর্ণ। বেশ মনে পড়ে, শীত তাড়াতে একটি বাছুর সেই তন্দুরের গা চাটছিল।

যাই হোক, এই অচেনা জায়গায় আমাদের অস্তিত্বটাকে প্রথমে লিগালাইজ করা উচিত। ওরা গেল জিলিপির অস্তিত্বময়তার দিকে। আমি গজগজ করতে করতে টিকিট ঘরের দিকে গেলাম এবং তৎকালীন সাড়ে ৬ আনা করে তিনটি চাইবাসার টিকিট কেটে ফেললাম। ভাগ্যিস, কেউ সম্বলপুর প্যাসেঞ্জার থেকে আমাদের নামতে লক্ষ্য করেনি।

চাইবাসা যাওয়ার মিটার গেজ ট্রেন উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে। যাত্রী নামমাত্র। অত ভোরে, অত কুয়াশায়, কামরার পর কামরা ফাঁকা, একেবারে শেষের বগিটিতে ওদের পেলাম। গোটা কামরায় শুধু শক্তি আর সুনীল পাল। জানালার ধারে এক চ্যাঙ্গাড়ি জিলিপি নিয়ে বসে। আমি টিকিটের কথা আর ওদের বললাম না। সে নিয়ে কারও মাথা-ব্যথা আছে বলেও মনে হল না। ইঙ্গিতে চ্যাঙ্গাড়ি থেকে জিলিপি তুলতে বলে শক্তি বলল, 'সমীর ঠিক কোথায় থাকে আমি জানি না। তবে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।' মুখভর্তি জিলিপি থেকে পড়ন্ত রস বাঁ-হাতের তালু দিয়ে ধরে বলল, 'ছোট্ট জাহায়গা।'

মিনিট পনেরোর মধ্যে ট্রেন ছাড়ল। তখনও কুয়াশা। বিধাতার আলোকসম্পাত যেখানে প্রথম এসে পড়ল, যেতে যেতে দেখলাম, প্ল্যাটফর্মের সেইখানটিতে এক সাঁওতাল রমণীর সটান মূর্তি টায়ে-টায়ে ফুটে উঠেছে। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তাকে ঘিরে ঘুরন্ত চলমান জঙ্গল। আজকের এই ইস্টিশানে-ভোর, এটা তার ওই ফুটে-ওঠার মতো, নাকি, ভোরবেলাটাই তার মতো— এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝে-ওঠা বেশ কঠিন। দূরে দিগন্তে, পাহাড়ের মতন মেঘমালা। নাকি, পাহাড়ই ওগুলি? বেশ কাছে টিলার মাথায় একটি নিশ্চল উইন্ডমিল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বিশাল চাকা, এমনকি স্পোকগুলি। যথারীতি সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। শক্তি দশের কমে ওটার দূরত্বকে কিছুতেই স্বীকার করবে না। আমি বলি, হাফ-এ মাইল। সুনীল পাল, দেড়। শেষমেশ তিন-এ রফা হল।

এ-বছর সারা মে ও জুনের কিছুটা, কার্যব্যপদেশে আমি ছিলাম আমেরিকায়।

এয়ারপোর্টে প্লেন নামার আগে মেঘের মধ্যে দিয়ে স্ট্যাচু অফ লিবার্টিকেও অবিকল অনুরূপ আদিবাসিনী দেখিয়েছিল। মশালে আগুন, আমেরিকার স্বাধীন জেনানাকে ঘিরে ঘুরছিল অতলান্তিকের সমুদ্র-জল, ২৭-২৮ বছর আগে দেখা, রাজাখার্শোয়াং-এর কুয়াশা-কাটা রমণী-মূর্তির কথা প্লেনে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎই মনে পড়েছিল।

ডব্লু টি আমরা রাজাখার্শোয়াং জংশনে পৌঁছই তখন ভোরবেলা। প্রচণ্ড শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সেই গরম জিলিপি খাওয়া, আহা, জিভে লেগে আছে। রাজাখার্শোয়াং টু চাইবাসা ৬ আনা করে তিনটে টিকিট কেটে আমরা দিব্যি পৌঁছে গেলাম চাইবাসা। মিটার গেজ প্যাসেঞ্জার ট্রেন টিকটিকিয়ে চলেছে তো চলেইছে— পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগল। ৬ আনায় রেলে চেপে তখন কতটা পথই না যাওয়া যেত।

এ পর্যন্ত রাহা বলতে মোট খরচ হয়েছে ৩ টাকা। বিয়ারের দাম আমি দিয়েছি। সুনীল পালের মাইনের দেড়শো এখনও আনটাচ্ড, ক্যাশিয়ার শক্তি আমাকে জনান্তিকে জানায়। তার শ্মশ্রুগুম্ফময় হৃদয় থেকে উৎসারিত ঝলমলে হাসি জানিয়ে দেয় ভবিষ্যৎ আমাদের অমনই উজ্জ্বল।

কিন্তু সমীরের ঠিকানা? শক্তি জানে না। জানে না তো জানে না। আমরা খোঁজ খবর করে ডিস্ট্রিক্ট ফিশারি অফিসে যাই। জানা গেল, ইনস্পেক্টর সাহেব ট্যুরে গেছেন। আসতে দিন চারেক।

সমীরদের বাড়ি পাটনায়। চাকরির কারণে এসেছে চাইবাসায়। শহরের উপকণ্ঠে নিমডি বলে একটা পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে একা থাকে। নতুন পোস্টিং। খাওয়া-দাওয়া মেসে। ওর অফিস-কলিগরা সেই মেসেই আমাদের তিনজনকে খুব খাইয়ে দিল। বড় বড় মাছের পিস। মুড়ো। ফিশারিজের মেস বলে কথা। খেতে খেতে জানা গেল এই সব তথ্য। বাড়ির চাবি সে রেখে যায় না। যায়নি।

কোথায় থাকা যায় তাহলে। আমার মাথার মধ্যে হেসাডির বাংলোটি হঠাৎ ভেসে উঠল।

হেসাডি? হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে তো রাঁচির রাস্তায় চক্রধরপুর পেরিয়ে যে ৩০/৪০ মাইল পাহাড় জঙ্গল পেরতে হয়— তারই মাঝামাঝি একটা জায়গা। বাংলো আছে। রাঁচির বাস ছাড়বে দেড়টায়। ঘণ্টা চারেক লাগবে। সন্ধের আগেই আমরা পৌঁছে যাব।

ব্যস, আর কথা নেই। আমরা তিনজনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। বাসস্ট্যান্ডে রিকশয় যেতে যেতে আমি শক্তিকে বোঝালাম, হেসাডির মার নেই। হেসাডির জবাব নেই। চল, গেলে বুঝবি। স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে তা ওইখানে, ওইখানে, ওইখানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর আগে শক্তি কতটা কী ঘোরাফেরা করেছে জানি না, আমি কিন্তু বাড়ির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই 'চেঞ্জে' গেছি। তবে তাকে ঠিক ভ্রমপূর্বক অনট বা 'ভ্রমণ' বলা যাবে না। সে-সব ছিল নেহাতই স্বাস্থ্যোদ্ধারের ব্যাপার। সেই সব জায়গায় যাওয়া যেখানকার 'জল' ভাল, খাবার-দাবার সস্তা, এবং গ্যাঁট হয়ে ১ থেকে ২ মাস থাকা— 'চেঞ্জ' লাগিয়ে অর্থাৎ মোটা হয়ে ফেরা। তখন এত ওয়েয়িং মেশিন ছিল না। হাওড়া স্টেশন ছাড়ার আগে মাল ওজন করার যন্ত্রের ওপরেই আমরা একের পর এক দাঁড়াতাম— এমনকি দাঁড়াতে শেখেনি এমন শিশুকেও যন্ত্রের ওপর শুইয়ে দিয়ে ওজন নোট করা হত। ফেরার সময় কারও কারও ওজন ৪/৫ সের বেড়ে যেত। কেন জানি না, আমার ওজন কোনওবারই বাড়ত না। ফেরার সময় ওজন যন্ত্রের কাঁটার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে প্রতিবারই হতাশ ও লজ্জিত হয়েছি এবং 'দুয়ো' পেয়েছি মনে পড়ে।

তো, একেবারে সেই শিশুবেলা থেকে প্রতি বছর আমি বাড়ির সঙ্গে চেঞ্জে গেছি। ৪১ সালে যুদ্ধের সময় আমরা ৬ মাস ছিলাম রাঁচিতে, লেকের ধারে, কমিশনার হাতায় 'বাণী বিতান' বলে একটা বাড়িতে। তখন বছর আষ্টেক বয়স। সেই থেকে মনে পড়ে। তার আগে ডেহরি-অন-শোন আবছাভাবে। তারও আগে নাকি দেওঘর...মিহিজাম...এই সব। মনে পড়ে না। তবে রাঁচির পর থেকে পরপর বারবার কাশী, চুনার, বিন্ধ্যাচল, এলাহাবাদ, পুরীর পর পুরী... এই সব 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ে। কেন না, এ-সব ক্ষেত্রে ভ্রমণ বলতে তো শুধু সান্ধ্য আর প্রাতঃ! পুরী আর কাশী ছিল আমার মায়ের ফেভারিট জায়গা। বস্তুত, ১৯৫৫ সালের এক বিকেলবেলা যখন শক্তির সঙ্গে কফিহাউসে এবং সেদিনই রাতে সুনীলের সঙ্গে দেশবন্ধু পার্কে আমার আলাপ হল— তারপর থেকে ওদের অনেক চিঠিই আমি পেয়েছি কাশীর বাঙালিটোলায় 'স্বর্ণচ্ছায়া' বা বিন্ধ্যাচলের শিউপুরায় 'কেশরী ভবন' বা পুরীর স্বর্গদ্বারে 'সৈকতাবাস' নামে বিভিন্ন বাড়িতে।

কিন্তু ভ্রম-পূর্বক অনট বা টু ওয়ান্ডারিং অ্যারাউন্ডের দিক থেকে সেগুলোর কোনওটাকেই 'ভ্রমণ' বলতে পারি না।

এবং ও অতএব, শক্তির সঙ্গেই আমার জীবনের প্রথম ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা হয়। এজন্যে ওর কাছে আমি ঋণী। আমার ধারণা, শক্তিরও তাই। সেটাই ছিল প্রথম প্রণয়। ওর হয়ত— 'চলো বেড়িয়ে আসি' বহটির উৎসর্গ-পাতা তাই তো বলে। যদিও আমার সম্পর্কে 'নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রথম সঙ্গী' এইটুকুই মাত্র শক্তি লিখেছিল। 'আমার প্রথম নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গী' এ কথা লেখেনি।

যাই হোক ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় আমি শক্তি আর সুনীল পাল দুটি পাহাড় পেরিয়ে তৃতীয় পর্বত চূড়ায় একটি অজানা জঙ্গলের মধ্যে একটি বাংলোর ধারে বাস থেকে নামলাম। তখন সন্ধেবেলা। বাস থেকে নেমে একদম রাস্তার ধারেই লাল খাপরা চালের বাংলোটি। বেশ বড়সড়। মোরামের রাস্তা। সামনে নীলাভ-সবুজ প্রকাণ্ড লন। এইটুকু যা ফাঁকা। এছাড়া চারিদিকে শুধু থম-ধরা জঙ্গল। ('ছুটে কে তুলিলে শালবন, বাহুবন্ধন চারিধারে': শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

চারিদিক এত নিঃশব্দ যে কোথাও একটা ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে তা থেকেই জলপ্রপাতের শব্দ হচ্ছে যেন। তা নয়। সেই প্রথম দেখা থেকে আমি জানি, কাছেই একটি বড়সড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রপাত রয়েছে। বাস থেকে আমরা একটি দরকারি শব্দ হাতের মুঠোয় করে নেমেছি। আর সেটি হল: লেমসা।

বাংলোর সামনে হাতির বিশাল নাদা পরপর পড়ে আছে। তা থেকে হু-হু করে উড়ছে ধোঁয়া, সহসা দেখলে মনে হবে আঁচ দেওয়া হয়েছে কাঁচা কয়লার উনুনে। বোঝা গেল, একপাল হাতি এসেছিল আর তারা খুব বেশি দূরে নেই।

চারিদিক নিস্তব্ধ। এমনকি পাখিরাও চুপ, যদি থেকে থাকে। উড়ন্ত ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে ওর ভারি গলা যতদূর সম্ভব ব্যারিটোনে নামিয়ে এনে 'চৌকিদার' না বলে শক্তি হেঁকে উঠল:

'লেমসা!'

আর কিছু না পারি চৌকিদারের নামটা আমরা আগেভাগেই জেনে নিয়েছি। এবং এটা জানা অত্যন্ত জরুরি। তার নাম ধরে ডাকা। যে আমরা নতুন নই। আগেও এসেছি। নামধাম, নাড়িনক্ষত্র সব জানি। এখানে আমাদের হক আছে। বস্তুত, বনে জঙ্গলে বাংলো পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের এই 'ট্রিকটা' বারবার কাজ দিয়েছে।

ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হতে হতে শক্তির গলা ঝর্নার শব্দের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কেউ সাড়া দিল না। আমি আর সুনীল পাল মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম। ওর মুখে আমার মুখের বিবর্ণতার ছায়া।

অতঃকিম? আজ তো আর ফেরার বাস নেই। সন্ধ্যার পর এ রাস্তা দিয়ে বাস-ট্রাক কিছুই চলে না।

শক্তি এবার ডাকল:

ছাউ-কিদার।

হাইফেন এই জন্যে যে গলায় যত জোর সে ওই স্ব-ভাবিত 'ছাউ' শব্দে ঢেলে দিয়েছিল। যেভাবে 'অবনী বাড়ি আছো' পড়ার সময় 'অ'-তে দেয় আর কী। ও-সব বনী-ফণী কিছু না। 'অ'-ই আসল।

উত্তরে লেমসা নয়, চৌকিদার নয়, দু-তিনশো গজ দূর থেকে যূথদলপতির বৃংহতি ভেসে আসে। হয়ত সে-ই 'ছাউ'!

সে হুঙ্কারের মহিমা ভাষায় রাখা অসম্ভব। জঙ্গল কেঁপে ওঠে থরথর করে।

লাভ অ্যাট আর্লি মর্নিং

কেউ যদি আমার কাছে জানতে চান এতগুলো বছর বেঁচে থেকে তোমার ভাল কি কখনও, একটুও লাগেনি? এর উত্তরে, 'না' বলতে পারলেই হয়ত ঠিক বলা হত। তবু বলব, যে জায়গা আগে দেখিনি, যেখানে আগে যাইনি, সন্ধ্যাবেলা পৌঁছে পরদিন ভোরে যদি সেই জায়গাটি তার মুখ দেখায়, তবে সেটা বোধহয় তো ভালই লেগেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তত জায়গাটি যদি হয় হেসাডি, আর সঙ্গী যদি থাকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো বন্ধু, তবে তাকে জীবনের এই মাঝ-দরিয়া থেকে দেখা শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় ফেলে-আসা তীর বলেই মনে হয়, আজ ৩৯ কাব্যগ্রন্থের জনক শক্তি যখন ছিল অস্খলিত-কৌমার্য, 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য'র কবিতাগুলি নিয়ে সে যখন খেলিত বিশ্ব লয়ে, এ সেই নিষ্পাপ ভোরবেলার কথা। ওই কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত প্রায় সব পদ্যের প্রথম শ্রোতা ছিলাম হয় আমি, না হয় তন্ময় দত্ত, নতুবা দু'জনে একসঙ্গে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই তখন দুটি কি তিনটি পদ্য শুনতে হত। শক্তি অনেক পরে একবার আমতার মাটির ডাকবাংলোয় আমাকে বলেছিল, 'কুঁজোর মতো। গলা পর্যন্ত ভর্তি হয়ে গেছে মনে হয়। তখন ঠিক লিখি না, গ্লাসে জল ভরে রাখি আর কী।'

লিখলে, একটা পদ্য শক্তি তাই কখনও লেখেনি।

শক্তির সঙ্গে আমার হেসাডির গল্প শেষ হওয়ার নয়। যদি এমন হতে পারত যে, মৃত্যুর পরে-টরেও আমার কিছু উড়ে বেড়াচ্ছে, তবে তা হত সেই 'লাভ-অ্যাট-আর্লি-মর্নিং' হেসাডিতে শক্তির সঙ্গে একসঙ্গে টানা দিন-কুড়ি থাকা। জঙ্গলের পথে-বিপথে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো। সে কী আমরা ঘুরে বেড়াতাম, না শতশৃঙ্খল মোচনের পর আমাদের স্খলিত সত্তা, তা জানি না। শুধু জানি, সমস্ত সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার বাইরে সত্তার সেই স্বাধীন উন্মোচনের জন্য আর-একবার জন্মাতে ইচ্ছে হয়। যখন-তখন শক্তির অনুচ্চ গভীর গলা থেকে উঠে আসত রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি।

আমরা কৃত্তিবাসীরা প্রায় সবাই অল্পবিস্তর গান গাইতে পারি। সুনীলের সঙ্গে আমার তো বাচ্যার্থেই 'গান গেয়ে পরিচয়'। একদিন নুর মহম্মদ লেনের বাসায় আমার জীবনে মোট যে ৫টি কবিতা, তার প্রথমটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটা লিখেছি ('পর্বতশিখর হতে পড়ে যায় অবসন্ন দিবা...')।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় সেটা পড়েই চমকে বলল, 'একী, এ তো খাঁটি পয়ার— ১৮ মাত্রার! চলুন, আপনাকে সুনীলের কাছে নিয়ে যাই।' রাত ৯টা নাগাদ নিয়ে গেল দেশবন্ধু পার্কের উত্তর-পূর্ব কোণে। এক ফুরুস গাছের নিচে দেখলাম ৭/৮ জন যুবক, একজন আধা-চিৎ, কেউ কেউ চিৎ-ভঙ্গিতে, কেউ-বা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। এটা ছিল কৃত্তিবাসের নৈশ অফিস, যা প্রতিদিন বসত। আমি প্রণবের সঙ্গে গিয়ে এক পাশে বসলাম। শক্তি তো আমাকে দেখে অবাক। কারণ, ওর আমার আর তন্ময়ের আগেই চেনা হয়েছে-— এমনকি একদিন কনজিউমেশান বা মদ্যপানও হয়ে গেছে।

মনে আছে, সবাই সেদিন ছিল কেমন বিষণ্ণ, চুপচাপ। অনেকক্ষণ চুপচাপ, তারপর শক্তি আমাকে একটা গান গাইতে বলল। লজ্জা করার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, আমি ধরেই নিয়েছিলাম আমি যদি বায়স কণ্ঠ হই, এরা গর্দভ। আমি গাইলাম।

'ঝরান-ও পাতার-ও পথে, কুসুম দলিয়া পায়। তরুণ তাপস কে গো, বিজন বনের ছায়...'।

উমা বোসের গাওয়া হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের গান। মনে হয়, সুনীল গানটি আগে শোনেনি। বা, আমার ওই 'ঝরানো'র 'ও' এবং 'পাতারো'র 'ও'-তে সুরসাগরীয় অব্যর্থ সুরসম্পাতে আধা-চিৎ যুবাটি খুব ইম্প্রেসড হয়েছিল। অন্ধকার থেকে শক্তির কাছে জানতে চেয়েছিল। 'বাঃ, কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাইল শক্তি?' সেই প্রথম আমি সুনীলের হেঁড়ে গলা শুনলাম, যা গম্ভীর ও অতলস্পর্শী বলে পরে মাহাত্ম্য পেয়েছে। না-অতিবিলম্বেই আমি জানলাম, যে কৃত্তিবাস আসলে একটি ব-কলমে গায়কগোষ্ঠীও বটে। সবাই গান গাইতে পারে। এবং অনেকেরই রয়েছে ইউনিক গায়ন-ভঙ্গিমা। এদের বন্ধু সুবোধ বসুই (যুগান্তর) সবচেয়ে খারাপ গাইত। কারণ, সে গান শিখেছিল। সে-ভাবে শিখলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গান যে খর্বতা পেত, মিডিয়ার রনপার ওপর দাঁড়িয়ে তা যে সময়সাপেক্ষে, দেবব্রতর চেয়ে উচ্চতাপ্রাপ্ত ও দ্রুতগামী হত এতে আমরা কেউই সন্দেহ করি না। দীপক মজুমদারের কণ্ঠসম্পদ ন্যাশনাল আর্কাইভে রেখে দেওয়ার মতো। যে-সব টেপ-কোম্পানি বাজারে ক্যাসেট ছাড়ে, তারা একপিঠে শক্তি ও অন্যপিঠে দীপক মজুমদারের কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করে বাজারে ছাড়লে প্রমাণিত হবে আমি সত্যের অপলাপ করিনি। প্রণব রীতিমত তালে-লয়ে গাইত, উৎপলকুমার বসুর গলায় ছিল জন্মগত কর্ণাটকি কাঁপন, এটা তার কথা বলার সময়েও থাকে। সুনীলের গলায় তত সুর নেই। কিন্তু গায়ের জোরে, প্রায় গুণ্ডামি করে, সে যেভাবে তার গম্ভীর গলার গানকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলে, সেটাও শোনবার (এবং দেখবার) জিনিস। বলা বাহুল্য, এরা সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া অন্য কিছু গাওয়া বিনীত ডিগনিটি মনে করত। শুধু তারাপদ রায় মাঝে মাঝে এসে গেয়ে যেত: 'জিয়া বেকারার হায়, ছায়ি বাহার হায়।'.... রাত ৯টায় কফিহাউস থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে দেশবন্ধু পার্কের দিকে হেঁটে যাওয়া, এ ছিল সেই মধ্য পঞ্চাশের যুগে আমাদের নিত্যকর্ম। ওই দলের সামনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা যে ঢ্যাঙা ছেলেটাকে সর্বাগ্রে যেতে দেখা যেত— যে গাইত না— শুধু মাঝে মাঝে মাটিতে পা দিয়ে তাল ঠুকে হাতখানা আকাশে তুলে দিয়ে— 'আ!'— বলে উঠতে যাকে 'দেখা' যেত, সে এই অধম। অবশ্য দেখেছে আর কে। মহাকাল ছাড়া এত দায়-দায়িত্ব আর কারই বা।

হেসাডি-প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ থেকে বারবার শক্তি আর আমার কথা বলছি। এই জন্যে যে সুনীল পাল প্রথম রাতেই আমাদের মহুয়াপর্বের বহর দেখে পরদিন সকালবেলায় বাসে চক্রধরপুর হয়ে কলকাতায় চলে আসে। দুর্ভাগ্য তার। সে তার টাকাকড়ি সবই শক্তির কাছে জমা রেখেছিল।

কোনও জাহাজডুবির পর যারা বেঁচে ফেরে, তাদের বলা হয় 'দেখলে তো, ঈশ্বর পরম করুণাময়!' যদিও আমার মনে হয়, ঈশ্বর কী মাল, এটা তারাই সবচেয়ে ভাল বলতে পারবে যারা খাবি খেতে খেতে মরেছে। ঈশ্বর-অনুসন্ধান তাদের কাছেই করা উচিত। (এক্ষেত্রে সুনীল পাল।) প্রথম রাতে খাওয়া-দাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই হল না, শুধু মহুয়া, কারণ, যে ব্যবস্থা করবে সেই চৌকিদারই মেহফিলে যোগ দিয়ে ঘোর মাতাল হয়ে পড়ে। পরের দিনও শক্তি স্রেফ মহুয়া দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছে দেখে, সুনীল পাল টাকা চাইল। শক্তি তার সামনেই তাড়াতাড়ি লেমসাকে একটা মুরগি আনতে টাকা দিল, কারণ, অন্তত একটা লাঞ্চের ব্যবস্থা না হলে আমিও সুনীল পালের সঙ্গে ওয়াক-আউট করব বলে ভয় দেখিয়ে রেখেছি। শক্তি ওকে কত অনুনয় করল, অন্তত দুপুরের ঝোল-ভাতটা খেয়ে বিকেলের বাসে যেতে বলল— কিন্তু না, কিছুতেই না। পা নামিয়ে সুনীল পাল দাঁড়িয়ে রইল। ওহো, অতঃপর, ওকে গুনে-গুনে পথ-খরচা ছুঁড়ে দেওয়ার নিষ্ঠুর দৃশ্যে সুনীল পালের চোখে শক্তিকে নিশ্চয় চোয়াল-নড়া ঘাতক-ঈশ্বরের মতো দেখিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কষ্ট হয়েছিল খুবই। কারণ, আমি তখনও পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাস করি। আদি সাম্যবাদী সমাজের শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ও-সব ভারতীয় গ্রাম্যতার বালাই ছিল না। বেচারা সুনীল পাল তাই টাকা দশেকও পায়নি।

সুনীল পাল পরদিনই আমাদের ত্যাগ করল।

দ্বিতীয় হেসাডির গল্পে রইল বাকি দুই। শুধু আমি আর শক্তি।

হেসাডি জায়গাটা কেমন তার বিস্তারে গিয়ে বোর করতে চাই না। আমি বরং শক্তির সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা বলতেই আগ্রহী— যে কোথাকার জল শেষমেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াল। সব নাটকেই একটা দৃশ্যপট লাগে। তাই বোধহয় এই দ্বৈত-নাট্যে হেসাডি লেগেছিল— যা ছিল পাহাড়ের পর পাহাড় দিয়ে সাজানো একটা হাজার আড়াই ফিটের নিঃসঙ্গ পর্বত চূড়া— যার সামনে দিয়ে চারবার বাস যাতায়াত করে— ক'টি-বা কন্ট্রাক্টরের কাঠ-বোঝাই লরি— কাছেই সেকেন্ড-টু-হুড্রু জলপ্রপাত এক— সারাদিন সারারাত শুধু ঝর্নার শব্দ— পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সোংরা নদী, নদীর ওপারে গ্রাম, তার নামও সোংরা। নিচে থেকে ঘুরে ঘুরে যখন ওপরে উঠে আসে চাকা-অলা দেশলাই বাক্স, মাছি-গুঞ্জনের মতো বাস বা ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দ তখন থেকেই শোনা যায়। এটা ছিল খুব ইমপর্ট্যান্ট, আমাদের পক্ষে। কেন না, ওই বাস বা লরির ড্রাইভার হয়ত আমাদের জন্যে আনছে এক পাউন্ড পাউরুটি, চা-চিনি অথবা ১০ প্যাকেট ক্যাপস্টান।

আহা, প্রথম সাতদিন আমাদের কী অসামান্যই না কেটেছিল। অর্থাৎ, যতক্ষণ সুনীল পালের (পুঁজিবাদী মতে) ১৩০ টাকা আমাদের হাতে ছিল। তখনকার দিনে কম টাকা নয়। ১৩০০ তো হবেই। বাংলো ফ্রি। কেন না, পরদিন বুকিং-এর কাগজ চাইতে এলে আমি পকেট হাতড়ে পেয়েছিলাম এসপ্ল্যানেড স্টোর্সের বিয়ারের রসিদ আর লেমসা সেটা সর্বান্তঃকরণে সন্তর্পণে কেন গ্রহণ করেছিল তা বুঝেছিলাম বাংলোর রেজিস্টার দেখে, যাতে গত মাস-দুয়েক আগে ডি এফ ও-র পর ভিজিটরের ঘর ছিল বিলকুল ফাঁকা। অবশ্য, জানা গেল, দিন-সাতেক আগে এসেছিলেন মিঃ অ্যান্ড মিসেস বিয়ার।...এক ভল্লুক দম্পতি (তাঁরা নাকি সারারাত বারান্দায় ছিলেন)। তাঁদের কথা যদি বাদ দিই।

সাত দিনে অত টাকা কী করে ফুরোল, সাত পয়সার তৈল, কীসে খরচ হৈল? সত্যি সে এক রহস্য। কেন না মুরগি দেড় টাকা, ঢেঁকিছাটা লাল চাল এক পাই (কুনকে) ৪ আনা, আর ক্যাপস্টান সিগারেট ছিল ১০ আনা (৬৫ পয়সার মতো) প্যাকেট। প্লাস খাঁটি মহুয়া— ১২ আনা বোতল। দৈনিক ১০ টাকার বেশি খরচ হতেই পারে না। আমরা তো হেসাডি ছেড়ে কোথাও যাইনি, অন্তত পয়সা খরচ হতে পারে এমন কোথাও। জঙ্গলের গভীর, গভীরতর প্রদেশে চলে গেছি— বেশিরভাগই কাঠ-আনার লরিতে। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসেছি। সারাদিনে একটি পয়সা বাজে খরচ করার উপায় নেই।

কেন না, এখানে আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর, এরা সূর্যের সঙ্গে ওঠে ও সূর্যাস্তের সঙ্গে ঘরে ফিরে আসে, এরা সকালেই একবার-যা পেট পুরে খেয়ে নেয়, সন্ধ্যায় হাঁড়িয়া খায় যা একটি সম্পূর্ণ খাদ্যও বটে, এবং মহুয়া, যার তীব্র কষা স্বাদ অভ্যস্ত হয়ে গেলে ভালই লাগে— এরা খাদ্যের সঙ্গে কখনও মদ খায় না— এদের কোনও ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, অক্ষর পরিচয় নেই, সংখ্যা জানে না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট লাগে না, কারও চাকর নেই, কেউ কারও চাকর নয়, ডাক্তারবদ্যি নেই, বিদ্যুৎ নেই, এদের কারও ধন-সম্পদ নেই তাই দরিদ্রও নেই, এরা সবাই হয় গরিব না হয় সবাই বড়লোক— সবাই স্বাস্থ্যবান, এখানে কে যুবতী কে বা প্রৌঢ়া— বোঝা দায়— বেঁচে থাকার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সবই এরা পায় অরণ্য ও নদী থেকে— এক দেশলাই ছাড়া। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। ২০/৩০ মাইলের মধ্যে কোনও দোকান নেই। পর্বতশ্রেণীর নিচে সমতলে পৌঁছে খুঁটিতে প্রথম দোকান। কেউ কেউ বনে বা মাঠে কাজে যায় বটে— কিন্তু আসলে তারা যা উপার্জন করে তা টাকা নয়, আলস্য। এরা এত অলস যে বিশ্বস্তসূত্রে আমি জানি যে, বিবাহিতা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সপ্তাহে একদিনের বেশি যৌনমিলনের রেওয়াজ নেই। সন্তানাদি হয়ে গেলে মাসে একবার হলে তা নাকি যথেষ্ট। টাকা-পয়সা খুব বেশি খরচ করার উপায় এখানে কই?

অযৌন হনিমুনে

শক্তিকে, আমি মনে করতাম অবিনশ্বর বন্ধুত্ব।

সামাজিকতার প্রয়োজন একাধিক মানুষকে কাছাকাছি টেনে আনে ঠিকই, আর তাঁরা মনে করেন ওর কাছে আমি অনেক পেয়েছি, ও ছিল আমার সঙ্গে রাজদ্বারে এবং শ্মশানেও থাকবে, অতএব ও আমার বন্ধু। হেসে তাকে বলার, এ-সব ভুল ধারণা। এগুলো খুব সামান্য সম্পর্ক, দীর্ঘদিন সাবধানে সতর্ক মেলামেশার ফলে এই সব কবন্ধের জন্ম হয়। এ-রকম অবৈধ বন্ধু-সংসর্গ ব্যাপারেই অ্যারিস্টটল কত বার আপসোস করে বলেছেন, 'ও মাই ফ্রেন্ডস, আই হ্যাভ নো ফ্রেন্ডস!'

শক্তিকে বন্ধু হিসেবে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে আমার বোধহয় তো আধঘণ্টাও সময় লাগেনি। এবং পরবর্তী কালে (আনন্দবাজারে ঢোকার আগে পর্যন্ত) আমাদের বন্ধুত্বে কোনওদিনই বাইরের কোনও প্ররোচনার প্রয়োজন হয়নি, সবটাই ছিল দু'জনকে দু'জনের গ্রহণ করার একটা অন্তর্লীন ব্যাপার। আমি মনে করেছিলাম শক্তির চেয়ে গিফ্‌টেড মানুষের সংস্পর্শে আমি আগে আসিনি। আর সেইটুকু ছিল সব-যথেষ্টর বেশি। শুধু তাঁরা ওর-আমার ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন যাঁদের জীবনে এমন বন্ধুতা এসেছে। বন্ধুত্বই যেখানে এন্ড ইন ইটসেল্‌ফ। যাঁরা বলতে পারবেন, 'ও কেন আমার এত বন্ধু? কারণ, ও যে ও। আর আমি যে আমি।'

আর-একটু বলি? অনেকের ধারণা, নারীর সঙ্গে বুঝি বন্ধুত্ব হয়। এ-ব্যাপারে দত্তকুলোদ্ভব কবি বহুপূর্বেই বলে গেছেন, 'বৃথা এ সাধনা ধীমান।' আমি আর নতুন করে কী বলব। অতীতকাল থেকেই এটা বারবার স্বীকার করা হয়েছে যে নারীর সঙ্গে যতদিন শরীর-সম্পর্ক থাকবে ততদিন বন্ধুত্ব হতে পারে না। কেন না, যৌনতা-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে বন্ধুত্বও বারবার ঝরে পড়তে বাধ্য। অপরপক্ষে নারীর সঙ্গে যৌনতা-ব্যতিরেকী বন্ধুত্বের সকল প্রযত্নও, শিকড়ে জলবিহীন চারাগাছের মতো নেতিয়ে পড়তে বাধ্য এবং ইতিহাসসিদ্ধভাবে বারবার তাই হয়েছে।

নারী-সংক্রান্ত আমার এই সব কথা ছিল অপ্রাসঙ্গিক? নিঃসন্দেহে। তবে অপ্রাসঙ্গিকও একটি প্রসঙ্গ, এই কথাগুলি সে-হিসেবেও নেওয়া যেতে পারে। নিশ্চয়ই এই অ-প্রসঙ্গটি দু'জন পুরুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুত্ব কেন মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ— সেরা পাওয়া— তা বুঝতে সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, সমকামিতাও, নারীর মতোই, প্রকৃত বন্ধুতা দিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ পানীয় কী? নিঃসন্দেহে জল। দুই-পুরুষে বন্ধুতাও তেমনি।

অন্তত হেসাডির প্রথম সাত দিন এই ক্ষুদ-কুঁড়ো বন্ধুতার স্বাদ আমরা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলাম। দুই বন্ধুর অযৌন হনিমুন— এ ছাড়া আর কী বলা যায় একে। টানা সাতদিন কী যে রাতদিন বক-বকম করতাম দু'জনে তা আজ ভেবে পাওয়া মুশকিল। শুধু মনে পড়ে আমি যা বলতাম, এমন কি কিছু বলার উপক্রম করেছি কি, শক্তি হা-হা করে হাসতে শুরু করত। গভীর বনের মধ্যে রাস্তা ছেড়ে অনেকদূর চলে এসেছি, এক জায়গায় পাথর থেকে চুঁইয়ে পড়া জল জমে আছে— চারিদিকে ফার্নজাতীয় লতাপাতা খুব গাঢ়-সবুজ, বেশ একটা বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এর সরস্বতী কুণ্ড টাইপ। ওই স্ফটিক জল দেখিয়ে আমি শক্তিকে বলেছিলাম, 'দ্যাখ দিকিনি। কোথাও গোলমাল নেই।' অর্থাৎ ওখানে। ওই নীলকান্ত জল-স্ফটিকে। কী ছিল এতে? এ-হেন স্টুপিড মন্তব্যে? কিন্তু, এতেই শক্তি লুটিয়ে হাসতে আরম্ভ করল। মানুষের কী যে ছাই-পাঁশ মনে থাকে। আর কী যে থাকে না। এই ঘটনাটাই কেন যে মনে আছে! আমাকে যদি কেউ বলে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তোমার কী মনে আছে? আমি বলব, একবার শরতের হিন্দুস্থান রোডের বাড়িতে যাব, রাস্তার মোড়ে পানের দোকানে চুল আঁচড়ে নিচ্ছি, হঠাৎ পিঠে হাত, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বালো দেখাচ্ছে'— ওর বগলে খবরের কাগজ মোড়া কীসের একটা বোতল ছিল যেন। আমি ধরা পড়ে একটু বেশ লজ্জাই পেয়ে গেলাম। আচ্ছা, এটা কী একটা মনে রাখার মতো কথা? না, বলার মতো? শরৎ-সম্পর্কে এ-ছাড়া কিছুই বলতে পারব না চট্ করে। প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কতদিন একসঙ্গে নুর মহম্মদ লেনে থেকেছি। অথচ, ওকে মনে পড়ে শুধু 'কী' আর 'কি'-এর তফাত, 'নিভে' নয় 'নিবে' (কারণ শব্দটি এসেছে নির্বাপণ থেকে) বলে দেওয়ার জন্য— এবং 'রৌদ্র হয়েছে অতি তীক্ষ্ণ, মোর আঙ্গিনা হয়নি যে নিকোনো'— এটাই বাংলা কবিতায় শ্রেষ্ঠ অন্তমিল— এ-রকম মতামতের জন্য। খুব সুন্দরভাবে মনে পড়ে, একদিন বসন্ত কেবিনে সুনীল বলেছিল, 'যাই, একটু যোষিৎসঙ্গ করে আসি।' বলে সত্যিই, আড্ডা ছেড়ে উঠে গিয়েছিল। তখন দুপুরবেলা। যাক সে কথা। এমনই বোধহয় হয়। এই সব আন-কথাই মনে থাকে। 'অকারণে'।

এলিয়টের মৃত্যুর পর প্রকাশিত এক বিশাল কমমেমোরিয়াল ভলিউমে সবাই দিস্তে দিস্তে লিখল। শুধু এজরা পাউন্ড লিখেছিলেন পাঁচ লাইন। যথা: কে আর লন্ডনের অলি-গলি দিয়ে হাঁটার সময় অমন শুখা হিউমার করবে! আর ওর কবিতা নিয়ে কী আবার বলব। শুধু বলতে পারি: রিড হিম।

ব্যস্, আর কিছু লেখেননি।

অবশ্য এতদ্দ্বারা এজরা পাউন্ডের সঙ্গে আমি কিন্তু নিজের তুলনা করলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, ওঁর নাম উচ্চারণ করাতেই আমার ঘাট হয়েছে। আমি শুধু বলতে চাইছি, এমনটাই হয়। চোখের পাতা দেখা যায় না। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে কোনও মূল্যবান মুহূর্ত মনে পড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অকারণে' শব্দটি মনে করলেই আমার শক্তির একটি অনির্বচনীয় পঙ্‌ক্তি: 'একখণ্ড আমার করে ধু-ধু/করে ধু-ধুই/অকারণে, মনে পড়ে।

শুধু শক্তি প্রসঙ্গে হীরা-টুকরো ঝকঝক করে যত্রতত্র। এই তো সেদিন, তখনও অ্যাকাডেমি পেলেও না-হয় কথা ছিল। 'এলফিন' থেকে বেরিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ কফিহাউসের সামনে জুতো পালিশ করাচ্ছে। তখন বিকেল বেলা। শীতকাল। আমি কফিহাউসে ঢুকছি। শুনলাম, সবেগে কাপড়া মারতে মারতে, হঠাৎ থেমে, শ্যু-সাইন-ম্যান সুলতান আলি ওর বসন্তের দাগে-ভরা বে-পালিশ মুখটা শক্তির দিকে তুলে দুঃখ করে বলছে, 'শাক্‌তিদা, আপনার একটা কাভিতার কিতাব আমাকে দিলেন না!'

লোকটা বাংলা না জানুক, উর্দু ফার্সি-আরবি যা হয় একটা কিছু জানলেও না হয় ভাবতাম তার একটা হক আছে। কিন্তু, সে নিরক্ষর!

শক্তি আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'পারবি, এত নিচে নামতে?'

ল্যাপিয়ের তাঁর 'সিটি অফ জয়' বইতে এক জায়গায় লিখেছেন দেখলাম, এই একটা শহর, আহা, যার সর্বহারা নাগরিকও (মাথায় ছাদ নেই, সাকিন ফুটপাথ) 'আপনি ভাল আছেন তো?' জিজ্ঞেস করতে ভোলে না। না জানি, শক্তি-সুলতান আলি সংবাদ জানা থাকলে তিনি কী লিখতেন।

শক্তির সঙ্গে আমার অনেক বিষয়েই মিল। শুধু মস্ত গরমিল ছিল নারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে। একটুও মিল ছিল না। শক্তি কোনও-একটি বিশেষ রমণীর সঙ্গে একটা প্রায় অযৌন রিলেশনশিপ করাতে বিশ্বাস করত। যৌনতা ব্যাপারে ওর কোনও আগ্রহ যুবাবয়সে দেখিনি। আমি মনে করতাম, এটা একটা ধার-করা রাবীন্দ্রিক ধারণা। যৌন-সম্পর্ক ছাড়া কোনও নারী-প্রেমই সিদ্ধ হতে পারে না, যেমন হতে পারে না সিলমোহরের ছাপ না-পড়া খাম, তা সে যতই নীলাভ হোক, আমি এমনটাই মনে করতাম। প্রকৃত প্রস্তাবে এ-সবই হয়ত ছিল আমার অজুহাত। বয়স পঁচিশ, আমাদের সময়ে মেয়েদের কাছে লাঞ্ছনার কথা আজকের ছোকরাদের আর কী বলব, হ্যান্ডশেক করতে চাইলে হাত তুলে নমস্কার ঠুকে দিত, উচ্ছ্বাসবশত ঝটিতি তা করে বসলে 'গায়ে হাত দিলে যে'— চোখে তাকাত। তুলনায়, বাবার স্ট্রোক হলে মার সঙ্গে আরও কম বয়সে ঘাটশিলায় গিয়েই প্রথম দেখলাম, বিশ্বসুন্দরী সাঁওতাল মেয়েরা সপ্রেম চোখে তাকালে তুলনাবিহীনভাবে বেশি আগ্রহে প্রতি-চাহনি দিয়ে থাকে— তারা অনেক সহজ আগ্রহে ভালবাসতে এগিয়ে আসে। ভালবাসতে? হ্যাঁ, ভালবাসতে। দরদস্তুরের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই, যদিও শরীরের সঙ্গে খুব আছে।

একটু পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল বলে, আমি শক্তিকে ছেড়ে প্রায়ই দূর-দূর হাটে চলে যেতাম ও ওঁরাও মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার সুযোগ খুঁজতাম। শক্তি অত্যন্ত সচ্ছল বিদ্রূপাত্মক হাসি দিয়ে এই সব লক্ষ্য করত। একদিন আমার একটু জ্বর-জ্বর হয়েছে। শক্তি গায়ে হাত দিয়ে দেখে হাসল।

'হাসলি যে!'

হাসি বজায় রেখে শক্তি এবার নাড়ি দেখল।

তারপর বলল (হেসে), 'তোর কামজ্বর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ কেউ ভাবছেন হয়ত, এ-সব ডায়ালগ হয়নি, আমি এখন বানিয়ে লিখছি। তা কিন্তু নয়। আমার যেটুকু অব্যর্থভাবে মনে আছে আমি সেটুকুই লিখছি। বানিয়ে লিখলে সুশ্রী (প্রিটি) হত, যেমন হয়েছে সত্যজিতের 'অরণ্যের দিনরাত্রি', এতক্ষণে শর্মিলা আর কাবেরী বোস ব্যাডমিন্টন খেলত। প্রশ্রয়সূচক হাসির সঙ্গে, পুরু কালচে ঠোঁটের কোনা মুচড়ে, হেসাডির বাংলোয় ওর সেই বাঁকা মন্তব্য আজও কানে বাজে। দেখতে পাই ওর সেই সচ্ছল বিদ্রূপের শানে ধারালো হাসি। যেন বলছে, দেন, গো অ্যাহেড। যা হাটে গিয়ে আঁজলা পেতে মেয়েগুলোর কাছে হাঁড়িয়া খেয়ে আয় গিয়ে। তোর জ্বর সেরে যাবে...।

'আমি সোংরার হাটে যাচ্ছি।'

'যা।'

'তুই যাবি না?'

'আমার মহুয়া আছে।'

তা, আমার এমনতর নারী-কাতরতা ছিল। আজও আছে। আমার, জীবনের তিনভাগের এক ভাগ গেছে নির্বোধ ঘুমে। বাকি দু'ভাগের অর্ধাংশ গেছে নারী-পাথর উল্টে দেখতে, দেখতে, দেখতে। যারা যুবাবয়সী তাদের কাছে এ-ব্যাপারে অ্যাপোলজি চাইবার কিছু নেই। কিন্তু পাঠকদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ নিজ নিজ যৌবনকালের কথা ভেবে তাঁরা আশাকরি নিজদোষে আমাকে মাফ করে দেবেন।

'দিন ফুরালো, ব্যাকুল সাঁঝে'

তারপর কোনও-একদিন টাকা গেল ফুরিয়ে। আমরা দু'জনে হয়ে গেলাম এমন দু'জন মানুষ যাদের কাছে টাকা কেন— একটা ফুটো পয়সাও নেই। আর বলাবাহুল্য তারপরেই আমাদের সম্পর্ককে ঘিরে যে-সব ছোটখাটো ঘটনা ঘটতে থাকে তার তীব্রতম টেনশন ও তজ্জনিত রাগারাগি সেই সব ক্ষুদ্রতা, এমনকি নীচতার কথা ভেবে আজ হাসি পায়।

হেসাডিতে বিনাপয়সায় আমরা ১৩ দিন ছিলাম, যদি ঠিক ৭ দিনের মাথাতেই পয়সা ফুরিয়ে থাকে। কী করে? ভেরি ইজি। দ্বিতীয় সপ্তাহটা রাজার না-হোক প্রজার হালে তো কেটেছিলই। সমস্যা হয়েছিল শেষ ৩ দিন কাটানোয়।

আমরা চৌকিদারকে বললাম, যেমন চলছিল চালিয়ে যাও। কাল-পরশুর মধ্যে চাইবাসা থেকে আমাদের বন্ধু সমীর রায়চৌধুরী এসে যাচ্ছে— কলকাতা থেকেও যে-কোনও মুহূর্তে টাকাকড়ি নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসে পড়তে পারে। দু'জনকেই খবর দেওয়া হয়েছে (সত্যিই হয়েছিল)। সেই হিসেবে আমি আশপাশের গ্রামে গিয়ে ধারে মুরগি আনতাম, রেকমেন্ড করত চৌকিদার লেমসা। অনেক সময় ওর বিধবা মাও সঙ্গে যেত। লেমসা প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে মাইফেলে যোগ দিত, আশপাশের গ্রাম থেকেও লোক আসত মদ খেতে, সিগারেট খেতে, যা অজস্র ছিল আরও ক'দিন, বোধহয় ওই অঞ্চলে রটে গিয়েছিল যে কলকাতা থেকে দু'জন মহানুভব এয়েছেন বিস্তর পয়সাকড়ি নিয়ে এবং শুধু তাই নয়, তেনারা একটি দানছত্রও খুলেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই আমাদের একটা রেপুটেশন তৈরি হয়ে ছিল। সে-হিসেবে দিনসাতেক ধারে ক'দিন মুরগির ঝোল আর ভাত দু'বেলাই জুটে যাবে, এ আর বেশি কথা কী। মহুয়ার অফুরন্ত সাপ্লাইও ছিল ধারে। আমি বলতাম, ডেফার্ড পেমেন্ট। ধারের এ-রকম ব্যাখ্যা শুধু ইংলিশেই সম্ভব। আর, তাই না শুনে সেই থেকে শক্তি আমার ইংরেজি জ্ঞান সম্পর্কে ডগমগ, তারপর থেকে বছরের পর বছর, 'তোর মতো ইংরেজি কেউই জানে না'— এই ছিল আমার সম্পর্কে শক্তির ধুয়ো। অবশ্যই ওই 'কেউই'-কে 'কেহই' করে নিলে ভাষান্তরে বা বোধহয় দাঁড়াবে, 'ওর মতো ভিক্ষাবৃত্তি কেহই করেনি'— যা আসলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিমালার একটি। সম্পূর্ণ কবিতাটি স্মৃতি থেকে অবিলম্বে উদ্ধৃত না করে পারি না, যদিও তার আগে বলে নিই নইলে আর বলার প্রয়োজন হবে না আমাদের এই বরানগরের বাড়ির ফ্ল্যাটে শক্তির ৩৯টি কাব্যগ্রন্থের একটিও আমার কাছে নেই মায় আমাদ্বারা সম্পাদিত তার (এবং প্রকাশের) মিনিবুকটিও না এবং আর বলার প্রয়োজন হবে না এই কারণে যে আমি হয়ত পুজোর আগেই নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাব যা এর চেয়েও ছোট এবং সেখানে একটিও বই নিয়ে যাব না ঠিক করেছি, নিজের বই তো নয়ই কেন না ও হো বলতে ভুলেছি নিজের বই বা রচনা অর্থের মতোই আমি অনেককাল আগে থেকেই সঞ্চয় করি না.... কেন না,

আমার সমাধি তুমি চিনে রাখো, অনেকেই চেনে
অনেকে তো পথ দিয়ে যেতে যেতে পিছনে তাকায়
ঐখানে পড়ে আছে হাড়-বজ্জাতের হাড়-মাস: চেনো নাকি?
এদেশে নবীন নামে এক জেলে ছিল
এদেশে মহুয়া খুবই পাওয়া যেত
এদেশে জেনেছে লোকে ওর কোলাহল
ওর মত ভিক্ষাবৃত্তি কেহই করেনি...
চেয়েছিল একদিন হারমোনিয়াম!
ঐখানে পড়ে আছে— চেনো নাকি?
আমার সমাধি তুমি চিনে রাখো— অনেকেই চেনে।

যদি ছাপার ভুল না হয়, মনে হয়, হাড়-বজ্জাতের মাঝখানে হাইফেনটি আমি নির্ভুল লিখেছি। খুঁতখুঁতে পাঠক গোয়েন্দা লাগিয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারেন। সত্যত, হাইফেন, কমা, সেমিকোলন, ড্যাশ, লিডার (....) এমনকি স্পেশ-আউট, এগুলোও ভাষা। এগুলোও কবিতা। বা, সাহিত্য।

দ্বিতীয় সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম হাটবার পড়ল। শুনলাম, হাট জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মাইল পাঁচেক দূরে কোথাও। আমাদের অবাক করে দিয়ে হাটের দিন চার-পাঁচজন ওঁরাও মানুষ সক্কালবেলা বাংলোর কম্পাউন্ডে এসে দাঁড়াল। তারা নীরব। গায়ে কাপড়ের খুঁট জড়িয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। যাওয়ার নাম নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই নীরবতা।

এই নীরবতার ভাষা কী?

ওরা কেন এসেছে?

লেমসা বলল, আজ হাটবার। ওরা মুরগির, চালের, মহুয়ার দাম চাইছে।

এত তাড়াতাড়ি! এ ছিল আশঙ্কাতীত। আমরা ভেবেছিলাম, অন্তত দিনদশেক আমাদের গুডউইলেই চলে যাবে।

পরের হাটের আগে নিশ্চয়ই সব মিটিয়ে দেওয়া হবে, এমন আশা দিয়ে সে-যাত্রায় রক্ষা পেলেও আমি আর শক্তি বুঝলাম ব্যাপারটার গুরুত্ব।

এখান থেকে, আজকালের মধ্যে রাতের অন্ধকারে পালাতে হবে, এমনটাই আমি মনে মনে ঠিক করে রাখলাম।

সিংভূমের পোড়াহাট ডিভিশনের অন্তর্গত বিশাল জঙ্গলের মধ্যে সেদিনের সেই গোপনতম গোপন হাটে আমরা দু'জনেই গিয়েছিলাম, পরপর দু-দুটি পাহাড় ও এক.১ উপত্যকা পেরিয়ে। তৃতীয় পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় হাটটি। এমন হাটও যে হয়, আছে, তা জানতাম না। জীবনে সেই একবার।

তৈজসপত্র বলতে কিছু নেই। শুধু মহুয়া, হাঁড়িয়া আর জুয়ো খেলার হাট। মাটির হাঁড়ি, এমনকি জালাভর্তি হাঁড়িয়ার সামনে বুকে দু'হাত জড়ো করে আদিবাসী শাশ্বত নারীভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওঁরাও মেয়েরা, কে যে যুবতী আর কে নয় বোঝা দায়, প্রায় সকলেরই পরনে লালপেড়ে সাদা সম্বলপুরি শাড়ি। জালার মধ্যে হাত ডুবিয়ে তারা পরিবেশন করছে গরম হাঁড়িয়া— বড় বড় শালপাতা দিয়ে তৈরি এক-এক ঠোঙার দাম এক-এক আনা। নীলরঙা বা সাদা বোতলে মাটিতে রাখা তা ৫০/৬০ বোতল মহুয়া। মহুয়া ছোট ছোট কাচের গ্লাসে পরিবেশন করা হচ্ছে।

আর জায়গায় জায়গায় মাটিতে পাতা কাপড়ের ছকের ওপর পড়ছে লম্বাপানা ছক্কা— তা পড়ছে ছকের ওপর আঁকা মুকুট, হরিণ, ছুটন্ত বাঘ কি সূর্যমুখী ফুলের ছবির ওপর। এক- একটা ঘরে যে যা পারছে টাকা-পয়সা রাখছে। যার নম্বর মিলছে সে সব তুলে নিচ্ছে। হাঁড়িয়া বা মহুয়া খেয়ে আসছে। আবার বসছে জুয়ার থানে। এমন স্বাধীন, আদিম নিষিদ্ধ স্বেচ্ছাচারে এর আগে কখনও উপস্থিত হইনি। আরণ্যক লাস ভেগাস যেন।

সন্ধ্যার পরে সমাবেশ একটু পাতলা হয়ে এলেও, শেষ হয় না। কয়েকটি কুপি জ্বলে এদিক-ওদিক। অরণ্যঘেরা ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটায় জুয়ো চলতে থাকে— যাদের মদ ফুরোয়নি— সেই সব মেয়েরা তখনও যায়নি— কুপির সামনে নাভির নিচে শাড়ির পাড়ের লাল নামিয়ে একজন মেয়ে আমাকে মদ খেতে ডাকে।

লেমসার কাছে আট আনা নিয়ে আমি অনেকক্ষণ থেকে জুয়ো খেলেছি। ৫/৬ টাকা আমার পকেটে। আমি তার কাছে যাই।

সেই একটা রাত আমি আর শক্তি একসঙ্গে থাকিনি। কেউ যদি ওই সাংগ্রিলায় হেসাডি থেকে আমাকে নিয়ে যেতে বলেন, আমি পারব না। কেন না, সেদিন আমাদের প্রমত্ত পদচারণায় কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিগ্বিদিক ছিল না। আমরা সহসাই সেখানে গিয়ে পড়ি। ইনফ্যাক্ট, মাত্র মাসখানেকের মধ্যেই সদলবলে গিয়ে আমরা হাটটি আর খুঁজে পাইনি। তবে আমি আর শক্তি নিঃসন্দেহে ওই হাটে গিয়েছিলাম। জুয়ো খেলেছি। মহুয়া খেয়েছি। শক্তির মতে হাটটি নাকি রোগোদের পথে।

বিটার রাইস

দেখতে দেখতে পরের হাটবারটিও এসে গেল। হাটের দিন আদিবাসীদের মেলামেশার দিন। সারা সপ্তাহের রসদ এমনকি সংবাদ সংগ্রহের দিনও বলা যায়। কেন না, প্রতিটি হাটই এক-একটি জীবন্ত সংবাদপত্র। সকলেই পরিষ্কার কাচা কাপড় পরে এসেছে বাংলোয়, যারা আমাদের কাছে টাকা পায়। আমরা ৭ দিন পরেও টাকা দিতে পারব না শুনে মৃদু গুঞ্জন। ক্রমে কোলাহল। সেদিন রাতে সোংরায় মিটিং হল। সিদ্ধান্ত: যতদিন টাকা শোধ করতে না পারব, আমরা বাংলো এলাকা ছেড়ে যেতে পারব না। এবং মুরগি দূরস্থান, চাল-ডাল-তেল-নুন কিছুই কেউ আমাদের আর দেবে না। এমনকী বাথরুমটাও লেমসা বন্ধ করে গেল। ঘর তো বটেই।

বুঝলাম, আজ রাত থেকে বারান্দায় কাটাতে হবে। শক্তি কাগজপত্র কলম, আমি দু-একটা বই যা নিয়ে গিয়েছিলাম (একটা বই-এর নাম ছিল, খুবই ব্যঞ্জনাময়ভাবে নিঃসন্দেহে, 'দা ট্র্যাজিক সেন্স অফ লাইফ') নিয়ে বাইরে বেতের মোড়ায় এসে বসলাম। জামাকাপড় বলতে তো কিছুই নেই। এসেছি এক বস্ত্রে। তবে বাংলোর কম্বল গায়ে গিয়ে এতদিন দিব্যি কেটেছে। বোঝা গেল আজ রাত থেকে জুটবে না। কিন্তু কী অদ্ভুত ভদ্র এই বনবাসী জনজাতি। কেউ আমাদের একটা কু-বাক্য বলল না। গায়ে হাত তোলা তো কল্পনার বাইরে। শক্তির তৃষ্ণা আছে, কিন্তু ক্ষুধা নেই। থাকলেও আমি বেশ বুঝতে পারলাম, ও জানে, ওর মতো সহ্যশক্তি আমার নেই। আমি খাবার ঠিকই জোগাড় করব, এবং সে জানে, দুর্বলতাবশত ওকে তার ভাগ না দিয়েও পারব না। অন্তত, ওর কোনও উদ্যোগ না দেখে আমি তেমনটাই ভাবলাম। আমি ভাবলাম, সকালবেলাটা জলটল খেয়ে চলে গেলেও, দুপুরের খাবার ব্যবস্থা তো করতেই হবে। রাতেই বা কী? হরিমটর? আমার ভাবতেও কান্না পেল।

বাংলো কম্পাউন্ডের বাইরে রাস্তার ধারে একটা পাথরের ওপর গিয়ে আমি বসে রইলাম। আমার গালে হাত। নিশ্চয়ই রঁদার 'ভাবুক'-এর চেয়ে আমাকে বেশি চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

ওমা, মেঘ না চাইতেই জল! দেখি, এক আদিবাসী কুলি কাঁধে শূন্য বাঁক নিয়ে এগিয়ে আসছে। না, ঠিক শূন্য তো নয়। একটা দুটো বাটিও যেন রয়েছে তার বাঁকে। নিশ্চিত, তার দুপুরের খাবার!

বহুকষ্টে শেখা প্রেমের ভাষা দিয়ে আমি তার সঙ্গে আলাপ শুরু করি। সেই, 'কুতা তেন হিজু তানা' দিয়ে যার শুরু।

কী আছে তোর ওই বাটিতে, হ্যাঁরে? যা ভেবেছি। লোকটা বলল, খাবার।

কই দেখি, কী তোরা খাস?

কী যে বলেন বাবু, আমাদের খাবার কী দেখবেন। গরিব মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না-না। দেখা। দেখব কী খাস তোরা।

লোকটা বাটি খুলে দেখাল। দেখলাম, সে রানা প্রতাপ। ১২/১৩ খানা রুটি, মনে হল ঘাসের, তাই রানা প্রতাপ বললাম। খানচারেক তুলে দেখলাম, মাঝখানে এক চাবড়া চচ্চড়ি টাইপও রয়েছে।

আমি বললাম, তা গোটা চারেক রুটি আমাকে দে? দেখি, তোরা কী খাস। কী খেয়ে দরিদ্র ভারতবাসী বেঁচে আছে বছরের পর বছর— একদিন বাংলোর মুরগি-পোলাও তুচ্ছ করে— অন্তত একবার তা খেয়ে দেখব।

কী যে বলেন, বাবু, আমাদের খাবার আবার আপনি...

না-না অন্তত একদিন, একবার আমাকে দেখতেই হবে। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!

ঠিক এমনটাই যে অক্ষরে অক্ষরে বলতে পারলাম তা নয়। ভাবে-ভঙ্গিতে লোকটা তাই বুঝল। এবং সেরকম ভেবেই নারীসুলভ লজ্জায় মাথায় একহাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে চারখানা ঘাসবিচি বা বাজরার রুটি আমাকে দিল। তৎসহ সেই লাবড়া খানিকটা।

খাবার নিয়ে বাংলোয় ফিরতে ফিরতে আমার মনে হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগল এবং তা শেকড় ছড়িয়ে দিতে থাকল সরসর করে। আচ্ছা, এই যে রুটি, তরকারি, এ-সব কবেকার তৈরি? এটা যে টকে যায়নি, এতে ফাঙ্গাস গজায়নি, কে বলতে পারে। রুটিগুলি তো মিটসেফে থাকার কথা নয়। সারা রাত ঢাকা ছিল কি? যদি ইঁদুরে খেয়ে থাকে? হয়ত একটা সাপ শুয়ে ছিল এর ওপর সারা রাত। যেই না ভাবা, প্রায় ২৪ ঘণ্টা স্রেফ জল খেয়ে থেকে সর্ষে ফুলই দেখার কথা ছিল, আমি হঠাৎ একটা পাংশুটে কেউটে রুটির ওপর নড়ে-চড়ে শুচ্ছে দেখতে পাই। রুটিগুলো রয়েছে উনুনের ধারে, শীতে গা গরম করছে সাপটা, আমি দেখি। একবার স্বচক্ষে রুটিগুলোও ভাল করে দেখে নিই। না, রোঁয়া-টোঁয়া নেই গায়ে। এখনও নেই। ফাঙ্গাস হতে দেরি। কিন্তু, এই রুটিটার ধারগুলো কেমন নীলচে... আমি শিউরে উঠলাম। বাংলোয় ফিরছি। হাতে রুটি। তরকারি। দূর থেকে দেখলাম, শক্তি বলে-কয়ে লেমসার কাছে চায়ের জোগাড় করেছে এবং কাপ-ডিশ। কাঠকুটো জ্বালিয়ে সে চায়ের জল চাপিয়েছে। টেবিলে বাংলোর কম্পাউন্ড থেকে কুড়নো আধপোড়া সিগারেট বেশ কয়েকটি, পরে দেখেছি সব ক'টি ক্যাপস্টান (মানে, বেছে বেছে কুড়িয়েছিল)।

আমি বারান্দার টেবিলে রুটিগুলো রাখলাম। ভাবলাম, শক্তিকে দিয়েই পরীক্ষা করা যাক। সত্যিই যদি বিষাক্ত হয় রুটিগুলো, তাহলে আধঘণ্টার মধ্যেই জানা যাবে। সহ্যশক্তি না হয় বেশি, আহা, তারও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে।

শক্তি চা পরিবেশন করে বলল, 'তুই খাবি না?'

আমি বললাম, 'এন্-না। ছটা দিয়েছিল, আমি দুটো রাস্তায় মেরে দিয়েছি। যা খিদে।'

'আমি তাহলে...'

'হ্যাঁ। তুই সবক'টাই খেয়ে নে।'

শক্তি দুটো খেল। দুটো কী ভেবে রেখে দিল? অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ চা-টা খুব তেতো লাগল।

তলানিটা। কেমন গা গুলিয়ে উঠল। হেসে বলি,

'কীরে, বিষটিষ মিশিয়ে দিসনি তো?'

'তুই রুটি খেয়েছিস?'

মুখের পেশিটেশিগুলো কেন যে কথা শোনে না। আমার মুখ দেখে যা বোঝার মনে হয় বুঝে নিয়েই সে অমন কুৎসিতভাবে হাসছে।

তারপর পদ্য লিখতে বসল। তখন যে লাইনটা লিখছিল সেটা খুব মনে আছে। 'মনে হয় যেন সমূহ হরিণ পিছোয় যেদিকে....' জানি না ওই কবিতাটা ওই পঙ্‌ক্তি-সহ কোথাও ছাপা হয়েছিল কিনা, বা কোনও বইতে আছে কিনা।

এরপর শুরু হল অপেক্ষা। আধঘণ্টার মাথায় শক্তি মোশন ফিল করল। বলল, উঠবে। কোথায় যাবে? বাথরুম তো কাল থেকে বন্ধ। সামনেই সমতল ভূমিতে বাজরার ক্ষেত। ধানের তো না, তবু রৌদ্রছায়ায় এত লুকোচুরির খেলা সেখানে? কেন যে।

ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে অনেকটা হেঁটে গিয়ে একসময় শক্তি বসে পড়ল।

ফিরে এল যখন, আমি জানতে চাইলাম, 'কেমন হল?'

খুব উদ্ভাসিতভাবে শক্তি জানাল, 'ফাসক্লাস।'

আমার নোংরা ছোট মনের কথা আর কী বলব। ভেবে আজ হাসি পায়। আমার মনে হল, ওর কলেরার ফার্স্ট স্টেজ নিশ্চিত শুরু হয়ে গেছে। এ-ক্লাস অ্যাক্টর, তাই মুখে হাসি। শক্তি কুয়োর ধারে স্নান করতে গেলে, আমি সেই সুযোগে বাজরার ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার মধ্যে দিয়ে সেখানে গেলাম যেখানে শক্তি বসেছিল। কাছাকাছি মাঠের মধ্যে একটা পাকুড় গাছ ছিল আগেই দেখে রেখেছি।

তীব্র চোখে আমি শক্তির 'পুপু' খুঁজতে থাকি। এখানে, ওখানে, সেখানে। গেল কোথায়। লেমসার কুকুর তো ধারে-কাছে নেই। আমার পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। কাল রাত থেকে কিছু খাইনি। ক্ষুধা সেভাবে মোচড় দিচ্ছে পেটের মধ্যে যেভাবে গঙ্গার বুকে মুচড়ে স্টিমারে বাঁক নেয়।

তদবস্থায় পেট চেপে আমি সবিস্ময়ে দেখলাম, একজায়গায় লুকোচুরির খেলার মধ্যে বেশ সতেজ দুখণ্ড 'পুপু' পড়ে আছে। নিঃসন্দেহে শক্তির। তাকে ঘিরে সবুজ ঘাস। ঘাসের ডগা সাদা সাদা ছোট ফুল যেন ভোরের জোনাকি। এখনও শিশির মাখা: ঘাস এবং ফুল। এবং কফির গিফ্‌টেড ইয়েলো প্রিন্ট!

টেবিলে-রেখে আসা রুটি দুটিতে কামড় বসাবার জন্য আমার মুখ লালায় ভরে গেল। কিন্তু দৌড়ে এসে দেখলাম, লেমসার কুকুর, শক্তির পুপু তো নয়, আমার রুটি দুটি শেষ করেছে। তখন লাবড়াটা খাচ্ছে চেটেপুটে।

কারও কারও ঘটনাটা ভালগার লাগল কিনা, তা জানি না। কিন্তু এমনটাই ঘটেছিল, তাই লিখলাম। সত্যজিৎ রায়ের অরণ্যের দিনরাত্রির মতো কাবেরী বোস আর শর্মিলা ঠাকুরকে পিয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাখার ফাঁকে ব্যাডমিন্টন খেলতে দেখার সুযোগ তো আমরা পাইনি। পাইনি জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ী সান্যালের অতুলপ্রসাদ: কে ডাকে আমারে....

যাই হোক, এ তো কিছুই নয়। দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে এল। কাল বিকেলে শেষ খেয়েছি। আর একটা বিকেল হয়ে এল। পেটে এখনও দানাপানি পড়ল না? ওহো, মা না-জানি কত কষ্ট পাচ্ছেন!

শুনলাম হেসাডির ঝর্নায় একটি পিকনিক পার্টি এসেছে। আমি আর শক্তি খানিক জঙ্গল পেরিয়ে সেখানে গেলাম। সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে বাংলোর মেথরানি ফুলমণি, স্পাই হিসেবে, লেমসার নির্দেশে। আমরা পালিয়ে না যাই ওদের সঙ্গে।

ওঁরা এসেছেন রাঁচি থেকে জিপে করে। তখন শতরঞ্চি গোটানো হচ্ছে, আমরা যখন পৌঁছলাম। কত খাবার খেয়েছে এরা বোঝা যায় উচ্ছিষ্টের বহর দেখে।

ওদের সঙ্গে কাবেরী বোস-টোস ছিল হয়ত। কিন্তু আমার খিদে পেয়েছে। আমি দেখলাম, বিস্কুট, পাউরুটি, মাখন সব ওরা তুলে নিচ্ছে। এমনকি সেদ্ধ ডিম!

আমি চাইতে যাচ্ছি, শক্তি বলল, 'আপনাদের কাছে একটু চা হবে নাকি?' ওদের সর্বস্ব-প্রার্থনার এই শুরু ভেবে আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'মানে, আমাদের ফুরিয়ে গেছে, হঠাৎ আর কী। আনতে গেছে চক্রধরপুর থেকে অবশ্য। তবে কালকের আগে...'

পিকনিক পার্টির সবাই আমাদের দেখে খুব ভরসা পেল। তারা প্রবাসী বাঙালি, আমরা কলকাতার লোক শুনে খুব খুশি। ক'দিন এসেছি, ক'দিন থাকব.... কী করে আছি এখানে.... এই সব প্রশ্নোত্তর শুরু হল।

'আমরা তো মশায় বাঘভালুক ছাড়া কিছু আশা করিনি এখানে....' একজন স্মার্ট যুবক বলল (হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ.... শক্তির দমফাটা হাসি, আমার অপটু সঙ্গৎ)। পার্টির গিন্নিবান্নি মানুষটি প্রায় এক প্যাকেট চা বের করে আমার হাতে দিলেন। ওজন চার-পাঁচশো গ্রাম তো হবেই। গায়ে লেখা 'লোপচু'। উঁকি মেরে দেখি, খাঁটি গোলপাতা চা, সুগন্ধে ম-ম করছে।

'আমাদের খাবারদাবারও অনেক বেঁচেছে। যদি দরকার থাকে....'

'না-না। না! খাবার আমাদের ঢের।' শক্তি পিছিয়ে আসে, 'ডিনারে শিং মাছের ঝোল করেছে না?'

ওঁরা (সমস্বরে): শিং মাছ?

— আ– হ্যাঁ!

যুবকটি: এখানে?

শক্তি: আ-হ্যাঁ। খুঁটি থেকে এনেছে। 'আই সি।' স্মার্ট যুবকটি গোল্ডফ্লেকের টিন খুলে একটা সিগারেট তুলে শক্তির দিকে এগিয়ে দিল। আমাকে অবাক করে শক্তি বলল, 'এন্-নো। থ্যাঙ্কস।'

টিন আমার দিকে বাড়িয়ে: আপনি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নো থ্যাঙ্কস্।' তবে না বলে আমি পারি না, 'যদি চিনি থাকে একটু.... মানে এই দু-চার কাপের মতো আর কী....' বলে আমি চক্রধরপুর স্টোরি রিপিট করি।

শক্তির ভস্মলোচন দৃষ্টির সামনে একজন গিন্নিবান্নি মানুষ খুব সস্নেহে আমার হাতে আবার এক কৌটো চিনি তুলে দিয়ে জিপে উঠলেন। মাত্র ৪০-৫০ ফুট উঠেই জিপটা বনের মধ্যে বাঁক নিল। উঁচু রাস্তায় উঠে আবার দেখা গেল জিপটা। পিছনের সিট থেকে নীলাম্বরী পতাকা উড়ছে পতপত করে। কাবেরী বোসের লীলাকমল হাত-নাড়া থেকে চুড়ির ঝনাৎকার প্রাণে এসে বাজল।

প্রায় কেজিখানেক চিনি হবে কৌটোয়। শক্তির হাতে কৌটোটা তুলে দিতে গেলে সে তা নিতে অস্বীকার করে। কেন? আমার এই বারবার সাফল্যে জেলাসি না প্রেস্টিজ? যখন গাছপাড়া লেবু দিয়ে ৪০ টাকা কেজির (তৎকালীন) লোপচু গোলপাতা দিয়ে চা বানাব, দেখব শালা। তোর এই ছিঃ-ছিঃ কোথায় থাকে।

প্রেস্টিজ নষ্ট করেছি বলে শক্তি রাগ করে বাংলোয় ফিরে গেল। চা-টাও রেখে গেল। তখন কে জানত, এই মোরদাবাদী দানার চিনি, এই লোপচু গোলপাতা চা, তাতে দু-চার টিপ পাতিলেবুর রস— এ থেকেই জেগে উঠবে আমাদের মুক্তির গান। ডানা মেলে এই পোড়াহাট জঙ্গল-ডিভিশনের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে।

এখন আমার সামনে হেসাডির ঝর্না। মূলত সাদা-ধূসর পাহাড়ের মাঝখানে প্রায় ৪০০ ফুট উঁচু কালো শ্লেট পাথর। অত উঁচু থেকে দুটি ধারায় জলঝর্না নেমে আসছে। কালো মেয়ের আদুল পিঠে দুটি ঝকঝকে-সাদা বেণী যেন। পাহাড়ের গায়ে একটা পাথর কল। মানুষ ওখানে ভারা বেঁধে পাথর ভাঙছে। এত নিচু থেকে ওদের ইকড়ি-মিকড়ির মতো দেখায়। এখানে জল ও পাথর ঝরে পড়ছে একই সঙ্গে প্রায় শ-আড়াই ফুট ওপর থেকে। ঝর্নার প্রেক্ষাপটে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ফুলমণি।

নিচে ভুক্তাবশিষ্ট শেষ করছে লেমসার কানা কুকুর (যুগান্ত পেরিয়ে তার নামটাও মনে পড়ল— টমা!) চকচক করে মিল্ক-মেডের গা চাটছে।

ফুলমণি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'এ বাবু, ঘর যাবিক নাই?'

কত বয়স হবে ফুলমণির। আচ্ছা, আজ রাতে ফুলমণি আমায় খেতে দিতে পারে না?

পঞ্চাশোর্ধের মেথরানিকে রাতের খাবারের আশায় আমি ফেরার পথে সাদর আলিঙ্গন করি। সে বলল, রাতে অন্ধকারে সে আসবে। খাবার নিয়ে।

পঁচিশ বছরের শহুরে যুবক প্রেমিকের জন্যে রাতে ভাত নিয়ে আসবে পঞ্চাশোর্ধের মেথরানি-প্রেমিকা! কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় আমি তাতেই রাজি হলাম।

রাতে সে এল। বাংলোর ঘর খুলে আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে আহার। গরম কম্বল। এবং মৈথুন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই প্রৌঢ়ার সঙ্গে?

হা হতোস্মি। বা, ওগো মা!

স্তন্যদানের আনন্দে সে রাতে ফুলমণি আমাকে ভাত খাইয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাল যাতে দু'মুঠো ফোটাতে পারি সেজন্যে দূরদর্শিনী বেশ খানিকটা চালও আঁচলে বেঁধে এনেছে। বাংলোর আলো জ্বালানো হয়নি। আমাদের ঘিরে হেসাডির অন্ধকার।

পেট ভরে খাইয়ে সে দাম চাইল। মেঝেয় জুট কার্পেটের ওপর আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।

মানুষের পেশিগুলি সবসময় তার প্রভুর কথা শোনে না। সব ক্ষেত্রেই তা যে আপসোসের ব্যাপার হয়, তা নয়। আমি দেখলাম, অশেষ কৃতজ্ঞতাবশত আমি ঋণশোধে রাজি থাকলেও, আমার যৌনযন্ত্রটি কিছুতেই আমার হুকুম মানতে রাজি নয়। ক্ষুধা আমার জঠরের পেয়েছিল, তার নয়। পঞ্চাশোর্ধের প্রৌঢ়াতে উপগত হওয়ার ব্যাপারে তার স্বাধীন চিন্তা রয়েছে। তার বয়স পঁচিশ। তার প্রেস্টিজ নেই?

আমি ফুলমণির কাছে সে রাতের মতো তার হয়ে অ্যাপোলজি চাই। তার অনাগ্রহ তাকে নিজেই বুঝে দেখতে বলি।

দেখেশুনে ফুলমণি বলল, না-না, এ তো ঠিকই আছে। এতেই হবে।

তার পেঁকো ঘূর্ণিতে ডুবে যাওয়ার আগে এক বড় বন্ধুবিহীন অসহায় যুবক সেই প্রৌঢ়া কামাতুরার কাছে প্রশ্ন রেখেছিল, 'আচ্ছা, তোমার কোনও অসুখ-বিসুখ নেই তো?' অর্থাৎ, ভি ডি।

ফুলমণি, ঈশ্বরের দিব্যি করেছিল। বলেছিল, নেই।

এবং উপসংহারে আমার শেষ প্রশ্ন ছিল, তোমার বয়স কত?

কত বয়েস বুঝলেক নাই? ফুলমণি নথনি-নাড়া দিয়ে দরজা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল। মানে, এতক্ষণ তবে কী বুঝলে?

যা ঘটার, তা ঘটেছিল এবং ঠিক এইভাবে। এই ভাষায়। সাহিত্য করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাহলে অনেক 'সোন্দর' করে বলতাম। সে রাতের সেই বিটার রাইসের স্বাদ জিভ থেকে সারা জীবনে মোছার নয়।

পরদিন সকাল। সকালে উঠে লেমন-টি করে শক্তিকে ডাকলাম। পুরো এক কেটলি চা, তা ১০ কাপ তো হবেই। চা খেতে খেতে বুঝলাম, রাতের ব্যাপার সে সবই জানে। সে তবে ঘুমোয়নি, মটকা মেরে ছিল। আমাকে বাধা দেয়নি। এই নাকি বন্ধু। ছিঃ। এর ভরসায় আমি আছি। গতকালের রুটির ওপিঠের ব্যাপারটা ভুলে গিয়ে আমি বারংবার ধিক্কার দিতে থাকি নিজেকে।

যেরকম ঘাঘি বুড়ি, আর এতদিনের বিধবা, যে একজন ক্ষুধিত মানুষকে এভাবে এক্সপ্লয়েট করে, সে কী না করেছে এতগুলো বছর। কানা-খোঁড়া-কুঠে কার সঙ্গে না শুয়েছে। সে যে একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরনো রোগী এতে কোনও সন্দেহ নেই। আমি শক্তিকে জানালাম, 'আজ দুপুরের বাসেই আমি চক্রধরপুর যাচ্ছি।'

শক্তি: হঠাৎ?

আমি: চক্রধরপুরে গিয়ে আমাকে ইঞ্জেকশন নিতে হবে।

শক্তি একটু ভেবে বলল, 'কীভাবে যাবি?'

আমি: সে আমি ঠিক চলে যাব। বাসে, ট্রাকে, যদি জিপ পাই জিপে। (একটু চুপ করে থেকে) হেঁটে। যেতে আমাকে হবেই।

শক্তি বলল (হেসে): কিন্তু ইঞ্জেকশন? টাকা পাবি কোথায়?

টেবিলে ঘুসি মেরে আমি বললাম: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমি পেনিসিলিন নেবই।

— কেন, কিছু ফিল করছিস? কোনও সিম্পটম? শক্তি নিরাসক্তভাবে জানতে চাইল। অর্থাৎ, দ্যাট ইজ নান অফ মাই প্রবলেমস।

দুপুরে ভাত রাঁধল শক্তি। আমি দুটো ধুঁধুল পেড়ে এনেছিলাম জঙ্গল থেকে। আর চারটে ডাঁসা পেয়ারা। নুন দিয়ে মাখা সেই পিণ্ডির চেয়ে তেতো ধুঁধুলের টাকনা (চিবানো যায় না) দিয়ে লাল চালের এক প্লেট ভাত খাওয়া— তারপর দুটি করে পেয়ারা— জানি না শক্তির পক্ষে সেই ফলাহার ভোলা সম্ভব হয়েছে কিনা। আমার পক্ষে তো সম্ভব হয়নি। দিনে দিনে যেন বেশি করে মনে পড়ে। মনে হচ্ছিল, নিজের স্বোপার্জিত পিণ্ডি খাচ্ছি। শক্তির অবশ্য অত খারাপ লাগার কথা না।

দুপুরে আবার পোড়া সিগারেট। এবারে সবক'টি গোল্ড ফ্লেকের টুকরো। ব্যাপার কী!

শক্তি ঝর্নায় গিয়েছিল স্নান করতে। সেখানেই পেয়েছে। বেশ বড় বড় এবারের টুকরোগুলো। ছেলেটা ভাগ্যিস ছিল চেইনস স্মোকার। প্রায় খান-কুড়ি পেয়েছে।

লেমন-টির পর সবে গোল্ড ফ্লেক ধরিয়েছি— দেখি একটা জিপ বাংলো কম্পাউন্ডে প্রবেশ করছে।

জিপটা দেখে বাংলোয় সাড়া পড়ে গেল। লেমসা দৌড়ে গেল সেলাম ঠুকতে, ওর বৌ-মা এসে জানালা দরজা খুলতে লাগল, জানা গেল, ডি এফ ও সাহেব এসেছেন।

জিপ থেকে নেমে ডি এফ ও সাহেব সোজা বারান্দায় এলেন। আমাদের সঙ্গে বসলেন। নাম বললেন, কমলাকান্ত্ উপাধ্যায়।

তিনি কেন হঠাৎ এসেছেন বুঝতে আমাদের দেরি হয়নি। তাঁর ধারণা হয়েছিল 'দা বাংলা হ্যাজ বিন সিজড বায় টু আর্মড ডেকয়েটস'... কিন্তু এসে দেখেছেন দুই নিরীহ বঙ্গসন্তান, যদিও শক্তির হাতে অস্ত্রের চেয়ে যা শক্তিশালী— সেই কলম!

আমার পরিচয় দেওয়ার মতো কিছু নেই। কিন্তু শক্তির আছে। আমি খুব বড় মুখ করে বললাম, 'হি ইজ সাপোজড টু বি দা মোস্ট ট্যালেন্টেড বেঙ্গলি পোয়েট এভার...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মোস্ট ট্যালেন্টেড? হোয়াট অ্যাবাউট বোস?'

'বুড্‌ঢাডেব ইউ মিন?'

'নো-নো। সামবডি এলস? শুড... শুড...'

'দেন ইট মাস্ট বি শুঢ্‌ডা সাট্‌টা বোস।'

'আ-ইয়েস। শুড্‌ঢা! হোয়াট অ্যাবাউট হিম?'

কোথায় বুদ্ধদেব আর কোথায় শুদ্ধসত্ত্ব বসু! কিন্তু ভদ্রলোক বুদ্ধদেবের নাম শোনেননি। গতবছর শুদ্ধসত্ত্ব বসুর সঙ্গে ওঁর কোনও এক ডাকবাংলোয় আলাপ হয়। শুঢ্‌ডাসাট্‌টা মাস্ট বি দা মোস্ট ট্যালেন্টেড— অন্তত ওঁর তাই ধারণা। শুদ্ধসত্ত্ব তাই বলে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, শুদ্ধসত্ত্বর নাম আমরা জানি শুনে উনি আমাদের সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন।

— কেমন দেখতে বলো তো?

বুঝলাম, উনি আমাদের আইডেনটিটি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চাইছেন। আমি শুদ্ধসত্ত্ব বসুকে আজও দেখিনি। শক্তি তখনও না। আমি বলে যাই, 'মুন-ফেসেড, ইউ নো, ব্ল্যাক হেয়ার, বি-স্পেক্টাকলড্... কমপ্লেকশন ফেয়ার...' মনে হল মিলে যাচ্ছে। জয় মা তারা।

বলে বসলাম, 'অফ মিডিয়াম হাইট?'

ক্লিক। একদম মিলে গেছে।

তারপর আমি শক্তিকে দেখিয়ে বললাম, 'অ্যান্ড হি ইজ স্টাডিয়িং কম্পারেটিভ লিটারেচার অলসো।'

'কম্পারেটিভ?'

'লিটারেচার।'

বেনারস গ্র্যাজুয়েটের এটা খুব মনে লাগল। তিনি এমন বিষয়ের নাম শোনেননি। ব্যাখ্যা চাইলেন।

আসলে কম্পারেটিভ ব্যাপারটা তখন নতুন চালু হয়েছে। 'যার নেই পুঁজিপাটা', যেমন 'সেই যায় বেলেঘাটা'— আমরা কলকাতার ইউনিভার্সিটির ছেলেরা জানতাম, যার লেখাপড়া হওয়ার নয়, শুধু সেই যায় যাদবপুরে। বিশেষত, কম্পারেটিভে। দীপকের কাছেই আমরা প্রথম ডুরেনমাট, গনচারভ, রাইনার মারিয়া রিলকে প্রভৃতি শব্দ শুনি। (অনেকদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল 'মারিয়া' বুঝি একটি বাংলা ক্রিয়াপদ। অর্থাৎ কিনা, রাইনার নামে কোনও প্রতিভাবানের লেখা রিলকে বলে কেউ মেরে দিয়েছে।)

তখন সবে নবনীতা-দীপক-মানবেন্দ্র-অমিয় দেব— এরা এম এ করেছে কম্পারেটিভে। ব্যাপারটা যে কী, ঠিক জানা নেই। শক্তি তো দু-চারটে ক্লাস করেই বীতশ্রদ্ধ হয়। নোটবুকে এডগার এলান পো-র একটা কবিতা টোকানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে নাকি এর কম্পারেটিভ আছে। ওই সময় বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'এক গ্রীষ্মে দুই কবি'— দস্তইয়েভস্কি আর কে যেন— রাঁবো? ওদের অপরাধ দু'জনেই গ্রীষ্মকালে জন্মেছেন। পরে নবনীতা দেবসেনেরও একটি প্রবন্ধ দেখি— যাতে সে কামুর 'দা প্লেগ' এবং মানিকের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র প্রতিতুলনা করে। অপরাধ, দু'জনেই ডাক্তার। ওই নতুন সাবজেক্টটিকে জাস্টিফাই করার জন্যে তখন চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ পড়ে গিয়েছিল আর কী। নবনীতা বরং পুতুল নাচের শশীর সঙ্গে হ্যামলেটের একটা আত্মীয়তা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলে পারত, — যদিও তাদের একজন রাজকুমার এবং অন্যজন গ্রামের ডাক্তার। নবনীতার বৈদগ্ধ্যের কাছে এমন আশা করেছিলাম। হ্যামলেট যখন বন্ধু গ্লিনডেনস্টার্নকে একটা বাঁশের বাঁশি ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'বল দিকিনি, বাঁশিতে কটা ফুটো?' আর উত্তরে গ্লিনডেনস্টার্ন ফুটো গুনে বলতে যায়— তখন সে কত স্পর্ধিত ক্রোধ বা অধোমুখ দুঃখেই না হ্যামলেট বাল্যবন্ধুকে বলেছিল, 'আর-এ, আর-এ, তুই বাঁশিতে কটা ফুটো তাই জানিস না, আর এসেছিস হ্যামলেটে কটা ফুটো তা জানতে?'

বলাবাহুল্য, রাজার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে গ্লিনডেনস্টার্ন এসেছিল হ্যামলেট প্রকৃতই পাগল কিনা জানতে। কেউ কেউ বলতে পারেন, তা এর সঙ্গে শশীর সম্পর্ক কী। আমি যখন প্রথম কালনাগিনী দেখি (চিড়িয়াখানায় নয়), বসন্তদিনে তুমবনির মাঠে, ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে শিশির-ভেজা সে ছিল ঠিক আমার চটির তলায়। ছোট্ট ফণা তুলে যেন করজোড়ে সে আমাকে বলেছিল, 'ওগো পথিক, ওগো পা, ওগো চটি, আমাকে মাড়িয়ে দিও না যেন।' প্রগাঢ়নীল লিকলিকে ছোট্ট প্রাণীটি— সারা গায়ে চুনি-লাল বরফি— আমার তো তাকে দেখে মনে হয়েছিল সমুদ্রস্নাতা ভেনাসের সার্থক কটিবেষ্টনী হওয়ার যোগ্যতাই এর বেশি। এভাবেই হ্যামলেট পড়ে শশী আর কী।

যাই হোক। শক্তি উপাধ্যায়জিকে কম্পারেটিভ ব্যাপারটা নবনীতা বা বুদ্ধদেব বসুর চেয়ে মনে হয় ভালই বুঝিয়েছিল। ওঁকে বেশ সন্তুষ্ট দেখাল যখন টি-কোজিতে ঢাকা কেটলি ও সরঞ্জাম ট্রে-তে নিয়ে লেমসা বারান্দায় এল। চা-এ একটি চুমুক দিয়েই উপাধ্যায়জির অন্তঃস্থল থেকে প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে।

'আ। হা। দিস ইজ এক্সেলেন্ট।'

একে লোপচু, তায় গোলপাতা। কে বানিয়েছে দেখতে হবে তো! (আমি)।

শীতের বিকেল ফুরিয়ে আসছে পাহাড়ে। সাহিত্যিকরা যেমন লেখেন, গাছের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। বা, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে। সব আগে থেকে লেখা আছে। কোনও অসুবিধে নেই। নতুন কিছু লেখারও নেই। যেমন, 'গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পারো' তেমনি, সিংভূম অরণ্যের বিকেলবেলা জানতে চাও তো রেফার টু 'আরণ্যক'। 'এ যে কী অপূর্ব শোভা আহা, তাহা যে না দেখিয়াছে তাহাকে কী বুঝাইব?' (আরণ্যক)।

শক্তি যে কম্পারেটিভ লিটারেচার পড়ে, ততক্ষণে ডি এফ ও এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা শুঢ্ডাসাট্টা বোসকে চিনি এও ঠিক। কিন্তু শক্তি যে কবি তার প্রমাণ কী?

'এই যে' বলে আমি নোট বই খুলে দেখাই।

'প্রথম পাতায় যা এডগার এলান পো-র কবিতাটা। তারপর যা দেখছেন সব ওর লেখা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর নিজের।'

'নোওপ্। ইট কুড বি সামবডি এলসেস্। হি মাইট হ্যাভ কপিইড ইট ইন হিজ ওন হ্যান্ডরাইটিং।'

ওমমা! এ ঘটকে আমি এখন কোথায় বসাই? অথচ, আমরা জেলে থাকব না বাইরে, সবই এর ওপর নির্ভর করছে।

আমি বললাম, 'শক্তি, একটা লিখে দে।'

উনি আদেশ করলেন, 'রাইট এ সনেট প্লিজ। ফোর্টিন লাইনস। এ বি বি এ।'

লেমসা হ্যারিকেন বসিয়ে দিয়ে গেল। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। সাহেবের জিপ থেকে এল গোটা তিনেক মহুয়ার বোতল। রিয়েল স্টাফ বট ফ্রম রোগোদ।

তিনটে গ্লাসে মহুয়া ঢালা হল। লেমসা বসে রইল হাত পা মুড়ে, কুকুরের মতো।

'নাউ স্টার্ট।' উনি এক চুমুকে ফাঁক করে দিয়ে ঠক করে গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। শক্তি ও আমি ওঁকে অনুকরণ করি।

শক্তি পাতার ওপর লিখল:

'প্রভেদ জটিল'

বলে আমার দিকে তাকিয়ে দাড়ির জঙ্গলের ভেতর থেকে হায়েনার হাসি হাসল। তারপর লিখে গেল:

'প্রভেদ জটিল, অবগুণ্ঠিত সড়কে চাঁদের আলো/তাকে দিও ঐ ফুলটি কারনেশান/ কতদিন তার মুখও দেখিনি/চেনা পদপাত পিছল অলক কালো/ও ফুলের কথা বলো না কাউকে, বুড়ো মালঞ্চ...'

উনি পাতাটা কেড়ে নিয়ে আমাকে দিলেন। বললেন, 'ক্যা মতলব? ক্যায়সা সায়ের, বাতাও!'

বুঝলাম, এ পদ্য-পাগলাকে এখন বাতাতেই হবে।

এইভাবে শক্তি ২/৪ লাইন লেখে। আর আমি বাতাতে থাকি। কখনও ইংলিশে, কখনও হিন্দিতে। মোট তিনটি কবিতা উপাধ্যায়ের সভাকপি সেদিন রচনা করেছিল।

তারপর চলল হোলনাইট মদ্যপান। সঙ্গে মুরগির রোস্ট।

কোথায় আমাদের ধার-দেনা। কোথায় কী।

ভোরে উপাধ্যায়ের জিপে আমরা দিব্যি গড়গড়িয়ে চক্রধরপুর এলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানেই ওঁর অফিস। চক্রধরপুর থেকে চাইবাসা। উনি ভাড়া দিলেন। শক্তি চাইবাসায় থেকে গেল ছ'মাস। আমি সমীরের কাছে টাকা নিয়ে পরদিন কলকাতায় চলে এলাম। ঠিক সাতদিনের মাথায় আমার কাছে মৌলালির 'শ্যামল' রেস্তোরাঁয় চাইবাসার কাহিনী শুনে সুনীল ওখানে যেতে রাজি হল।

এবার দলে সুনীল, আমি, দীপক মজুমদার, সুবোধ বসু। মোট চারজন।

চাইবাসায় শক্তি যোগ দিল।

দিন দশেকের সে পাঁচ ইয়ারী কথার সর্বাধিনায়ক খচ্চরের পিঠে এক বামন...

আর তাঁরই নির্দেশে, দশদিন দশ রাত...

ফ্রম চাইবাসা টু হেসাডি...

ঘাস-বিচালি ঘাস!

ঘাস!

ঘাস!

ঘাস-বিচালি, ঘাস-বিচালি, ঘাস-বিচালি

ঘাস!

কিন্তু, সে তো আর একটা গল্প (হলেও সত্যি)!

বহুৎ দিন হুয়ে— আজ থেকে ২৪/২৫ বছর আগে মার্কাস স্কোয়ারের বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে কৃত্তিবাসের লেখকরা একটি দোকান দিয়েছিলেন, দোকানের নাম: অতি আধুনিকতা। পণ্য: স্বপ্ন। সেদিনের সেই স্বপ্ন-বিপণিতে বাঁদিক থেকে বসে বা দাঁড়িয়ে আছেন: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ কর, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (পাঠরত), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অধুনা-বিস্মৃত কেউ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত এবং এখন লন্ডন-প্রবাসী ভাস্কর দত্ত। অনুপস্থিত কুশীলবরা হলেন তারাপদ রায়, দীপক মজুমদার, উৎপলকুমার, তন্ময় দত্ত প্রমুখ। তখন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন, আর শক্তি চট্টোপাধ্যায় রাখতেন দাড়ি। সুনীল এবং প্রণব চেয়ারে বসে ৮ জনের পদ্য বিক্রি করছেন। গোলাপি বিয়ের পদ্যের কাগজে ছাপা, এক-একটি শিটে এক-একজনের একটি করে পদ্য। দাম ৫ পয়সা পদ্যপ্রতি। সুনীলের পদ্যটির নাম ছিল: তোমার স্ত্রী এবং আমি।

পিছনে কাঁটাতারের হ্যাঙারে এখন ঝুলছে নিখিলেশ দাসের তৈলচিত্র। পরে ছবি নামিয়ে ওখানে ছেঁড়া ন্যাকড়া, জুতো, ফুল, পা-জামা, মেয়েদের মাথার ফিতে— যে যা ইচ্ছে টাঙাতে থাকে। উৎপল একদিন টাঙিয়ে দিল দাঁড়সুদ্ধ একটি স্টাফ্‌ড টিয়া! টেবিলে ৮টি পদ্য পাশাপাশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুয়ে। আপাতত একটি গাছের ডাল। বোধহয় তো, প্রথমদিন বলেই। পরে পেপার ওয়েট হিসেবে ভাগাড় থেকে তুলে আনা গরু ছাগলের হাড়, করোটি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। কারণ, বিক্রিবাটা কিছুই হয়নি। রোজই নিত্যনতুন পোস্টার লিখে এনে লাগানো হত। একটি পোস্টারে ছিল: 'পুরস্কার নেওয়া চলে শুধু ঈশ্বর অথবা শয়তানের হাত' থেকে। ভোটে-জেতা মানুষের নোংরা হাত থেকে কোন শিল্পী পুরস্কার নেবে?'

—স.চ. ❐

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~